

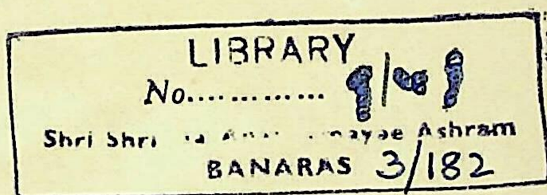
শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের

জীবন-কথা



শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, বি, এ




LIBRARY
No.............. १/५१
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS 3/182



শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবন-কথা

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বি, এ, কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

মূল্য ২৲ টাকা

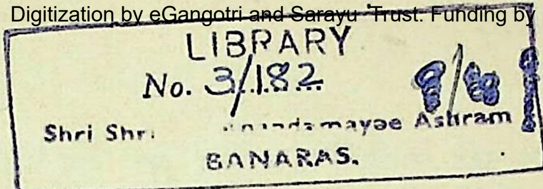
প্রকাশক ঃ

শ্রীনরেন্দ্র কুমার সিংহ রায়
শ্রীযোগেন্দ্র কুমার সিংহ রায়
পোঃ কৈলাইন, ত্রিপুরা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। দেওঘর, নির্ব্বাণ মঠ
২। বিতারা—সিদ্ধাশ্রম
পোঃ সাচার (ত্রিপুরা)
৩। বি, সরকার এণ্ড কোং
১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জীর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।



বিজ্ঞপ্তি

বহু অতীত যুগের এমন কি অনৈতিহাসিক যুগের সময় হইতে সনাতন ধর্ম্মের লীলা ক্ষেত্র ভারতবর্ষে অগণিত তত্ত্ব-জ্ঞানী মুক্ত মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে; এবং তাহাদের ভাব-প্রবাহ-সিঞ্চনে এদেশ চিরদিন জ্ঞান-ধর্ম্ম-ধারায় পরিতৃপ্ত রহিয়াছে। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্ম্ম। বৈদেশিক জাতীয় নিষ্পেষণে এদেশ ঐহিক সম্পদ হইতে বহু সময় বিচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু তাহার অমূল্য সার রত্ন—ধর্ম্ম ও তত্ত্ব-জ্ঞান চিরন্তন সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম মূলতঃ এক—কিন্তু দেশ ও কাল ভেদে ইহার বাহিক প্রণালীগুলি বহুবিধ আকার ধারণ করিয়া সাময়িক প্রয়োজনের পরিপোষকতা করিয়া থাকে। এজন্য যুগে যুগে আবির্ভূত মুক্ত পুরুষদের উপদেশ ও তত্ত্ব-কথা নূতন আকারে লোকের প্রাণে ধর্ম্মের উৎস প্রবাহিত করিয়া প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে; এক তত্ত্ব-জ্ঞানই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মুক্ত পুরুষদের বাণীরূপে লোকের প্রাণে নূতন নূতন ভাবোৎস উৎপন্ন করিয়া জীব জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে।

প্রত্যক্ষ জগতের এবং অন্তর্জগতের কর্ম্ম-পদ্ধতিসমূহ এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চলিতেছে এবং সেই শক্তি এমন সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতেছে যে, মহাপুরুষদের জগৎ-কল্যাণীভুত ভাব প্রণালী এবং কার্য্যাবলীও যেন সেই অপূর্ব্ব রহস্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মায়াময় জগতের প্রাণীসমূহ নিজ নিজ কামনা দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির অভাব পূরণ করিতেছে—কেহই স্থির থাকিতে পারে না; সকলেই কামনা বশতঃই কর্ম্মজাল তৈয়ার

করিয়া সৃষ্টির রহস্য সমাধান করিতেছে। দেখা যায় মাতৃ-স্নেহে মায়ের হৃদয় পরিপূর্ণ বলিয়াই সন্তান লালিত পালিত হইয়া থাকে; পরের দুঃখে হৃদয় বিভোর হয় বলিয়াই পরোপকারী জনের সাহায্যে অভাবগ্রস্থ লোক সমূহ প্রতিপালিত হইতেছে। মুক্তপুরুষদের লোক-কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাও তদ্রূপ ভাবেই সংঘটিত হইতেছে। জগতের লোকের প্রাণে ধর্ম্ম-ভাব জাগরিত করিবার আকাঙ্ক্ষা মুক্ত পুরুষদের নির্লিপ্ত চিত্তে কেন উদিত হয় এবং কেমন করিয়া উদিত হয় তাহা বিচার বুদ্ধির অতীত। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়া ভক্তদের জন্য অধীর ভাবে ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। জগদ্-গুরু বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভের পর জীব জগতকে ধর্ম্ম প্রদানের জন্য কতই না কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। দয়ার অবতার চৈতন্যদেব জীবের জন্য আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিলেন। মুক্ত মহাপুরুষদের জীব জগতের জন্য এরূপ দয়া ও প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দর্শন লাভ কালে আমরা তাঁহাকে আত্ম-ভাব-রসে ডুবিয়া থাকিতেই অনুক্ষণ লালায়িত দেখিতে পাইয়াছি। আমরা শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের তৎকালীন অবস্থায় পূর্ণ সমাধির ভাবনিচয় স্পষ্ট প্রতীয়মান দেখিতে পাইয়াছি এবং তিনিও তখন স্বকীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেন— "আছে মাত্র আকাশ জোড়া বিরাট হাসি।' "এই জগৎ কল্পনার তৈয়ারী;—কল্পনা ত্যাগ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যেন আকাশ ব্যাপী বিরাট হাসি।" তাঁহার আনন্দময় অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অন্যকে সেই অবস্থাই যে একমাত্র সত্য তাহা অনুক্ষণ বলিতেন। তাঁহার তৎকালীন ভাবাধিক্যের অবস্থা ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া কেহ অনুমান করিতে পারি নাই যে জীব জগতের জন্য তাঁহার অপরিসীম প্রেম ও ভালবাসা ফিরিয়া আসিবে। তাঁহার

নিজ ভাষায় কথিত বাক্যাবলীর মধ্যে আমরা শাস্ত্রীয় গূঢ় ভাব ও অর্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান দেখিতে পাইতাম। তাঁহার কথাগুলি ছিল সরল—কিন্তু অগাধ ভাব-সমুদ্রের লহরী মাখা। তিনি অদ্বৈত রসে বিভোর হইয়া সততই তত্ত্বের গূঢ় কথা, নিজ উপলব্ধ অসীম অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিতেন; তিনি বলিতেন "ব্রহ্মকে যে জানিতে পারে সেই ত ব্রহ্ম হয়।" শাস্ত্রে ও আছে "ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি"—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে, পারিয়াছেন তিনি ব্রহ্মের স্বরূপই হইয়াছেন। তিনি বলিতেন "আমার কিছু বলবার নাই ও জানার বাকী নাই।" তাঁহার উচ্চ কথা সম্যক্‌ ধরিতে পারি নাই। কিন্তু শাস্ত্রে আছে—

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তির কিছু জানিবার বাকী থাকে না, কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি সকল সংশয়ের অতীত অবস্থায় বিচরণ করেন। শাস্ত্র বাক্যের প্রমাণ না জানিলে তখন তাহাকে ধারণা করাই আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

সৃষ্টি রহস্যের অনির্ব্বচনীয় ভাব কি ভাবে লোক বুদ্ধির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, কি ভাবের প্রেরণায় মুক্ত ব্যক্তিরা নিস্কামচিত্ত হইয়াও জীবজগতের কল্যাণের জন্য অধীর হন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। দেখিতে পাওয়া যায় মুক্তাত্মারাই নিস্কাম ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা লাভ করিয়া আবার মোহ-নিদ্রাভিভূত মানবের মনে জ্ঞান ও প্রেমাকর্ষণ বিস্তার করিয়া তাহাদের প্রাণকে সঞ্জীরিত করিয়া দেন এবং লোক যেন সত্যের অনুসন্ধান পাইয়া মুক্তির অনুসন্ধান পায় তাহার পথ যুগে যুগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। অলোক সামান্য দৈবীশক্তিসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন জগতের কল্যাণে নিবিষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয় নাই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা

হওয়ার স্বল্প কাল পরেই তিনি তদীয় প্রিয় ভক্তগণের প্রাণে অপূ
প্রেমাকর্ষণ বিস্তার করিয়া মধুর লীলার সূত্রপাত করিলেন এ
তাহাদের কল্যাণের জন্য এবং ততোধিক সমগ্র জগতে ধর্ম্ম ও তত্ত্ব
ভাবের বন্যা ছড়াইয়া দিবার জন্য তীব্র আবেগ ও ইচ্ছার বশবর্ত্তী
হইয়া ভক্তগণসহ নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও বাস করিতে থাকেন।
তাঁহার উপদেশ ছিল বৈরাগ্য পূর্ণ; তিনি জগতের অনিত্যতাকে
সকলের চেয়ে দুঃখময় মনে করিতেন; দুদিনের জন্য মানুষে
জীবনের অভিনয়; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই—ইহার পশ্চাতে
মৃত্যু। বিবেক সম্পন্ন মানব এই অনিত্য জগতে শান্তি সুখের কোন
হেতু খুঁজিয়া পাইতে পারে না। এই জগৎ কল্পনার তৈয়ারী
মন-বিশ্লেষণ ও বিচার দ্বারা জগতের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলে ম
ক্রমশঃ স্থির হইতে থাকে এবং স্থির চিত্তে ব্রহ্ম-ভাব উপলব্ধি হই
থাকে। এবংবিধ ভাবরাশিই তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়া জী
জগতকে দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনে
ভাব-কথাগুলি বেদবাক্য তুল্য সত্য ছিল; তাঁহার বিচার ছি
জ্ঞান-গুরু শঙ্করাচার্য্যের বিচার বুদ্ধির সমতুল্য, তাঁহার সাধ
প্রণালী ছিল জগদ্ গুরু বুদ্ধের সাধনার মত—বুদ্ধ যেরূপ জ
ব্যাধি ও মৃত্যুকে দুঃখের কারণ মনে করিয়া জগতাতীত সত্যে
অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়াছিলেন ও নির্ব্বাণ-তত্ত্ব লাভে পরিতৃ
হইয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞ-মাও তদ্রূপ এই জগতের অসারত্ব মৃত্যু চিন্ত
দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং উদা
প্রাণে বিচরণ করিতে করিতে বাসনা বিনির্ম্মুক্ত হৃদয়ে ব্রহ্মর
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনে
কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলাম। ধর্ম্ম-প্রাণ লোকের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা
ও জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হইলে আমাদের আয়োজন সফল হইবে।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার বন্ধু প্রবর ত্রিপুরার কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দত্ত বি; এস, সি এবং ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্র নাথ ঘোষ এম বি মহোদয়গণ এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ে সহায়তা করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বিতারা-সিদ্ধাশ্রম

নিবেদক

গ্রন্থপ্রণেতা

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি। হরিঃ ওঁ॥



শ্রীশ্রীব্রহ্মাজ্ঞ-মা

উৎসর্গ

মদীয় সতীর্থগণের কর কমলে
প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ
অর্পিত হইল।

গ্রন্থ প্রণেতা

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মায়ের জীবন-কথা।

প্রথমা বল্লী।

জন্ম-বৃত্তান্ত ও বংশ পরিচয়।

"নদ্যঃ যথা স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

জীবন-মুক্ত মহাপুরুষদের জীবন-প্রবাহ নদী-ধারার ন্যায়। নদী নিজ গতিতে প্রবাহিত হইয়া কত দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া যায় এবং পরিশেষে অনন্ত মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। তাহার দুকুল প্লাবিত জল-রাশি কত শত মানবের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া দেয় তাহার ইয়ত্তা নাই। অসীম সাগরের অসীমত্বে ডুবিবার ক্ষমতা বহু লোকের ভাগ্যেই জুটিয়া উঠে না; অনন্ত ব্রহ্ম-ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে; তাহারা পারে তখন ব্রহ্ম-রস অনুভব করিতে যখন মহাপুরুষদের করুণা-বারি তাহাদের হৃদয়-দরজা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। সে জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে যেসকল মুক্তিকামী লোক সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের সেবা করিয়া তাঁহাদের কৃপাপাত্র হইতে পারে

তাহারা দেহ-বুদ্ধির অতীত হইয়া মুক্তি-তত্ত্ব আস্বাদন করিতে পারে।

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥"

যুগে যুগে অবতীর্ণ মুক্তজনের সঙ্গতি বহু মানবের গতি নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। "ক্ষণ-মিহ সজ্জন-সঙ্গতি-রেকা, ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।" কাজেই কোন সময় কোন দেশে কোন মহাপুরুষের জন্ম হইলে সেই দেশবাসী সৌভাগ্যবান্ হয়।

"দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দৈবানুগ্রহ হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥
বিবেক চূড়ামণি।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি আত্ম-দর্শনে সমর্থ হয় সে যে কেবল নিজের মুক্তি সাধনে সমর্থ হয় এমন নহে বরং তাহার উপদেশে, তাহার প্রভায় ও তাহার ভাবাকর্ষণে অপরাপর লোক ও মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তুর আস্বাদনে কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের অপূর্ব্ব জীবন-কথার অবতারণা করিবার প্রারম্ভে আমাদিগকে বলিতে হয় যে তিনি এক জন অলোক-সামান্যা দেব-সম্ভবা নারী ছিলেন। শাস্ত্রে উক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষদের শ্রেণী হিসাবে তিনি একজন নিত্য-সিদ্ধ আত্ম-দর্শী ব্রহ্মজ্ঞ-লোক ছিলেন। তাঁহার পবিত্র উদাস জীবনে তাঁহার

সাধনার কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নাই; তাঁহার মানসিক গতি আশৈশব নির্লিপ্ত ছিল; কোন জাগতিক পদার্থে তাঁহার মোহ পরিলক্ষিত হয় নাই; নিজ উদাস গতিতে বিচার-বলে তাঁহার মন যেন কোন অজানা স্থান হইতে বিচরণ করিতে করিতে লক্ষ্য বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে কোন পথিক কোন অচেনা স্থানে আসিয়া পড়িলে তাহা হইতে তাহার গন্তব্য-স্থল যেমন সহজ গতিতে বাহির করিয়া লয়, সেই পথিক সেস্থানে বসিয়া থাকে না, তদ্রূপ তাঁহার মন সহজে স্বেচ্ছাক্রমে জগতাতীত সত্যানুসন্ধানে চলিয়াছিল। মনের কোন বন্ধন ছিল না বলিয়া তাঁহার মন আশৈশব উদাস ছিল এবং কোন ভোগ্য বস্তুতে সুখানুভব করে নাই। তাঁহার মন বিচার-প্রবণ হওয়াতে কোন অনিত্য বস্তুতে তাঁহার মাত্রও সুখ বোধ হইত না। তিনি আশৈশব সর্ব্বদাই ভাব-রাজ্যে ডুবিয়া থাকিতে ভাল-বাসিতেন। ভাব-সাধনাই ছিল তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি। তিনি চিন্তা-ধারায় মজিয়া থাকিতে প্রয়াসী ছিলেন বলিয়া কোন জাগতিক ভাব তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি সততই জগতের অনিত্যতা চিন্তা করিতেন।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিতারা গ্রামে বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সনের ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার শুক্লা একাদশী তিথিতে তিনি জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী ও মাতার নাম ৺শ্যামাসুন্দরী দেবী। তাঁহার পিতা

একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহার চরিত্র ও ধীশক্তি প্রভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তিনি পূজা ও অর্চ্চনাদি কাজেই সময় অতিবাহিত করিতেন ও যজমানদের মনোরঞ্জন দ্বারা ও স্বীয় পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তির লভ্য অর্থে সন্তুষ্ট চিত্তে দিনাতিপাত করিতেন এবং আদর্শ গৃহীর মত অতিথি-সেবা ও পরোপকার প্রভৃতি কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা ছিল—কিন্তু তিনি এই কন্যাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। শৈশবে সাধারণতঃ ছেলেপেলেরা মাতার সঙ্গে চলা ফিরা করে, মাতার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ও শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-মা পিতৃ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পিতার এতাদৃশ সঙ্গ-প্রিয় হইয়াছিলেন যে পিতার সঙ্গেই তিনি প্রায় সময় অশন বসন ও শয়ন করিতেন। প্রণিধান করিলে ইহাতে অন্য এক রহস্যের উপলব্ধি হয়; পূর্ব্ব-জন্মার্জিত পুণ্যবলে তাঁহার এতাদৃশ ভাব জন্মিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ এইরূপ শুদ্ধাত্মার প্রতি তাঁহার এতাদৃশ আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁহার উক্ত মন-গতির ভাবেরই সূচনা করে। সাধারণতঃ মানুষের মন ভোগ্য বস্তু, মায়িক পদার্থ ও স্বজনের প্রতি অনুরক্ত হইতে দেখা যায়—বিচার ও বিষয়-বৈরাগ্য মনে সহজে উদিত হয় না; কিন্তু মায়িক পদার্থের ভিতর দিয়া কোন আশ্রয় অবলম্বনে মনে যদি আত্মানুরাগ উপস্থিত হয়

তাহাতেও সেই লোকের মুক্তির পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে পঞ্চ সাধনার কথা—শান্ত, দাস্য, সৈখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যাহার চিত্ত যে ভাবে গঠিত সে সেই ভাবে ঈশ্বর-প্রীতি-সাধনায় যত্নবান হইলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন মুক্ত পুরুষের প্রতি কোন লোকের ভালবাসা কোন হেতুকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইলেও তাহার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের পিতৃদেব তাঁহাকে কেবল শৈশবেই স্নেহ করিতেন এমন নহে, তাঁহার বাল্যজীবনে, সাধন-জীবনে, এবং সিদ্ধ-জীবনেও তদীয় অভাব অভিযোগ পরিপূরণ দ্বারা, রোগ উপস্থিত হইলে পরিচর্য্যা দ্বারা ও তাঁহার মানসিক গতির আনুকূল্য সাধন দ্বারা তাঁহার প্রতি তাহার প্রীতি ও স্নেহের নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে পীড়িত অবস্থায় দেখিবার জন্য সুদূর পুরীধামে গমন করিয়া তথায় তাঁহার পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের প্রতি তদীয় পিতৃদেবের এতাদৃশ ভালবাসার কথা আমরা বহু শ্রুত হইয়াছি। তাঁহার জননীও সাতিশয় শান্ত-স্বভাবের নারী ছিলেন; ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল এবং ভক্তি ও জ্ঞান-বৈরাগ্যের সমালোচনায় তিনি সময় অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন। এবম্বিধ সাত্বিক ও শুদ্ধপ্রাণ জনক জননীর ঘরে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মত দেব-সম্ভবা অলোক সামান্যা নারীর জন্মগ্রহণ প্রকৃতির নিয়মের অনুকূলতাই সম্পাদন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার শৈশব জীবনে পিতা মাতার আদর ও স্নেহের সঙ্গে তদীয় জনৈক পিতৃব্যের অত্যন্ত স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন ও তদীয় পিসতুত ভ্রাতা অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিত এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে তাঁহার জীবনের গতি-ধারার কার্য্য কলাপে পরিপোষকতা করিয়াছিল; ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবনের উচ্চ ভাব, উদাসীন গতি সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য ছিল; ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে গুলির ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে তৎসকলের বিরোধ ভাব না জন্মাইবার জন্য উপদেশ দিত এবং সাধ্যমত সেই ভাবনিচয়ের পরিপোষকতা করিত। প্রতিবেশী জনৈকা কায়স্থ নারী তাঁহাকে বাল্যাবধি অত্যন্ত আদর যত্ন করিত ও তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া তাঁহাকে আত্মীয়ের মত ভালবাসিত এবং ব্রহ্মজ্ঞ-মা ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার সঙ্গ-প্রিয় হইয়া চলাফিরা করিতেন। পরিবারস্থ সকল আত্মীয় স্বজনই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। অযথা খেলা-ধূলায় তাঁহার মন নিবিষ্ট হইত না এবং খেলাতে নিযুক্ত হইলেও তিনি খেলার মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া চলিতে অভিলাষী হইতেন। খেলার সাথীগণ ও স্বচ্ছন্দমনে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে ও তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছুক হইত। অন্নদা নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণ-দুহিতা তাঁহার বাল্য সহচরীদের মধ্যে অন্যতমা ছিল এবং তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিল। কি জানি কি অজ্ঞাত ইঙ্গিতে শৈশব-সাথীরা সকলেই তাঁহাকে

অত্যধিক ভালবাসিত এবং যাহাতে তাঁহার মনোরঞ্জন হয় এবং যাহাতে তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা পায় এই ভাবে চলিত। তিনি শৈশবের সাথীগণ সহ এইরূপে সুখ স্বচ্ছন্দতার ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

তিনি যেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশ অতি প্রাচীন সৎব্রাহ্মণ বংশ ছিল। কৌলিন্য হিসাবে স্থানীয় অপরাপর ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহাদের বংশের বিশিষ্টতা ছিল। পদ-গৌরবে ও তাঁহাদের প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহাদের পারিবারিক শালগ্রাম-শিলার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ছিল এবং এ সম্বন্ধে অপূর্ব্ব আখ্যান রহিয়াছে। এই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল এবং তাঁহারা হিন্দু প্রথানুযায়ী পূজা পার্ব্বণাদি কার্য্য করিয়া স্থানীয় লোকদের নিকট গৌরবান্বিত ছিল। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের পিতৃদেব ৺অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর শেষ জীবন-কাল হইতে তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের সহোদর ছিল পাঁচজন—সুরেন্দ্র, বগলা, যামিনী, রমণী ও যতীন্দ্র। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবদ্দশাতেই সুরেন্দ্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকে গমন করে। কনিষ্ঠ যতীন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের ভাবাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সংসার-বিরাগী হইয়া মায়ের সন্ন্যাসী ভক্তদের সঙ্গে সন্ন্যাস-জীবন যাপনে ব্রতী হইয়াছে এবং অপর তিনজন সংসার-আশ্রমে বাস করিতেছে। মায়ের প্রতি তাহাদের সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা যে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কতক

বিশিষ্টতা আছে। গ্রামটী ফাঁকা ফাঁকা বাড়ী সমন্বিত—ইহাতে বহু জনহীন ভিটি-বাড়ী আছে—গ্রামের প্রাচীনত্ব ইহাতে অনুমান করা যায় এবং অন্যান্য গ্রাম হইতে ইহার নীরবতা উল্লেখযোগ্য। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই প্রাচীন ধারায় হিন্দুয়ানী ভাবে সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। গ্রামের "নিরবতা" ও গ্রামবাসীদের সহজ জীবন-যাপন প্রণালী ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের ভাব-রাজ্যের ভাব সাধনার অনুকূলতা আনয়ন করিয়াছিল এবং সকলেই তদীয় উচ্চ ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি না করিতে পারিলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

দ্বিতীয়া বল্লী

"শৈশবাবস্থা"

মানব জীবনের আয়ুকাল অবস্থা ভেদে শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থাগুলি অভিনয় করিয়া চলিয়া থাকে। জীবনের এই অবস্থাগুলি একটীর পর একটী সমুদিত হইয়া কালোচিত অবস্থার অভিনয় সাধন করিয়া থাকে; এবং অভিনয় ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনের ভাব-কলি ফুটিতে থাকে। কলি ফুটিলে ফুলের বিকাশ, পরে ফুল হইতে ফল, ফল হইতে বীজ এবং বীজ হইতে গাছ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে। মানব জীবনের শৈশব-কালীন অবস্থা ও ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়নে পরিণত হইয়া পূর্ণ মানবত্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সৃষ্টির এই বিচিত্র ধারায় মানব জীবন প্রকৃতির ক্রীড়নক হইয়া চলিতে থাকে এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবের সার্থকতা আনয়ন করিয়া থাকে; ব্যক্তিগত জীবনে এই ভাব-বিকাশ ভবিষ্যৎ-জীবনের ভাব সূচনা করে এবং বাল্য জীবনের ভাব-ধারায় অনাগত জীবন-স্রোতের উদ্ভব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বাল্য-জীবনের বিশিষ্টতা—সরলতা ও কমনীয়তা; তখন মানবের মন জগৎ-ব্যাপারে নিবিষ্ট হয় না ও জটিলতার জালে জড়িত হয় না—সরল ও কমনীয় ভাবে মনের শোভন বৃদ্ধি পাইতে দৃষ্ট হয়। বাল্য জীবনের সৌন্দর্য্য সরলতা; তখন ব্যক্তিগত জীবনে

ভাব বিকাশের তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া ও তাহা প্রকৃতি নিয়মই মানিয়া চলে। মধ্যাহ্নে প্রখর কিরণ বিতরণকারী সূর্য্যো উদয় ও তরুণ অরুণ আভায় সমুদ্ভাসিত পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতি তাহার অনুরূপই—মানিয়া চলে। মহৎ জীবনের বিস্ময়-দি প্রতিভা ও জ্ঞান বাল্য জীবন হইতে ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া বর্দ্ধি হয়; উহা অস্বাভাবিক হেতুতে চলিতে পারে না। কাজেই কো মহৎ লোকের জীবন-ধারায় কোন অলৌকিক ভাবের বর্ণনা শ্রু হইলে ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। লোকোত্ত মহাপুরুষদের জন্ম ও জীবন-গতি প্রকৃতির নিয়মেরই অধীন কাহারও জীবনে কোন ভাবের অতি মাত্রায় স্ফুরণ পরিদৃ হইলে তাহা মোহকর বস্তু হয় না। ভাবিলে দেখিতে পাওয় যায় প্রকৃতির প্রতি কার্য্যই বিস্ময়কর। সুতরাং অতিমাত্রা পরিস্ফুট ভাবাবলীর নিদর্শনে তাহাকে অতিরঞ্জিত আকারে বর্ণন করিয়া সাধারণতঃ মানুষ নিজ জ্ঞান-তৃষ্ণা ও শক্তিকে খর্ব করিয়া ফেলে। কোন মহা-পুরুষের জীবনের কোন কো ভাবের বর্ণনায় সাধারণ লোক তাহাকে অতিরঞ্জিত আকারে বর্ণনা করিয়া অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিবের অংশ, ব বিষ্ণুর অবতার ইত্যাদি আখ্যায়িকায় পরিণত করিয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ অলৌকিকত্বের মূল্য সত্যের দিক হইতে কিছুই নহে অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ও মুগ্ধতা বিচারগত নহে, বরং উহা দ্বারা মানুষের মনে ধর্ম্মের গাঢ়ভাবের শৈথিল্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। খাঁটী বিশ্বাস বিচারমূলক—উহা দ্বারা প্রতারিত হইবার কিছু

থাকে না। মহাপুরুষেরা মানব-দেহ ধারণ করিয়া জন্মলাভ করিলে তাঁহাদের পক্ষে মানবোচিত ভাবের বিকাশই স্বাভাবিক—আত্ম-দর্শন লাভের পথে অদ্ভুত ভাবের ঘটনার সমাবেশ সত্যের অপচয় ঘটাইলে তাহার প্রচার লোক সমাজের কল্যাণের কারণ হইতে পারে না ও তাহা বিচারহীন ভাবে গ্রহনীয় নহে। বিচারহীন অলৌকিক ভাবে বিশ্বাস মানুষের মনকে দুর্ব্বল করিয়া থাকে ও জ্ঞান-তৃষ্ণা খর্ব্ব করিয়া ফেলে। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে আমরা তাঁহার জীবনের অালৌকিকত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন এবং বলিতেন যে জ্ঞান-পিপাসা ও বিচারশক্তির অভাব বশতঃই মানুষ অলৌকিকত্ব বলিয়া যে কিছু উপলব্ধি হয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞ-মা শৈশবে উদাসীন গতিতে বিচরণ করিবার কালে যে সকল বিশিষ্ট আচরণের ও ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অদ্ভুত হইলেও লোক-চক্ষুতে ধরা পড়ে নাই। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন শৈশবাবস্থা হইতেই উদাস ভাবাপন্ন ছিল; তিনি কোন বিষয়ে মনের শান্তি পাইবার মত ভাবে ও গতিতে চলিতেন না। স্বাধীন ভাব ছিল তাঁহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তিনি খেলাধূলা বা খাওয়া পরা সকল বিষয়ে উদাস ভাবে চলিতেন। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত তিনি খেলাধূলাতেও রস অনুভব করিতেন না এবং সে সকল তাঁহার নিকট বিশেষ ভালও লাগিত না। খেলা-ধূলায় নিযুক্ত হইলে তিনি দলপতি সাজিতে পছন্দ করিতেন;

এবং প্রায়ই খেলা-ধূলাতে তিনি পৃথক ভাবে থাকিয়া সাক্ষী স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে ভালবাসিতেন। এই প্রকার পার্থি আসক্তির বিষয়ে তাঁহার আসক্তি না থাকার কারণ কেহ অনুসন্ধান করার সুযোগ পায় নাই, বরং কেহ কেহ তাঁহাকে শান্ত ও নির্ব্বিলিক মনে করিত। কিন্তু তাঁহার কথা ও ব্যবহারে তঁহার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হওয়াতে কেহ তাঁহাকে আহাম্মকও মনে করিতে পারে নাই। খেলা-ধুলায় নিমগ্ন থাকার কালে তিনি কথন কখন হঠাৎ খেলা হইতে বিদায় লইয়া কি যেন কাহার ডাকে উদাস ভাবের প্রেরণায় খেলা হইতে অবসর লইয়া চলিয়া যাইতেন; তাঁহার মনে যেন একটা ছট্ ফট্ ভাব উপস্থিত হইত যাহার জন্য সে খেলাতে বেশী সময় নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন না। সঙ্গীয় ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারাও খেলাতে ডুবাইতে পারিত না তখন তাহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া খেলা করিত কিন্তু তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহাদের জন্মিত না ও জানিবার হেতুও ছিল না। সঙ্গীদের অনুনয়ে তিনি মাত্র জ্ঞাপন করিতেন যে তাঁহার কিছু ভাল লাগিত না। "তাহার কিছুই ভাল লাগে না"—এই কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শেষ জীবনেও অনেক শুনিয়াছি। জাগতিক কোন বিষয়ই তাঁহার ভাল লাগিত না এই ছিল তাঁহার সহচর বাক্য। তাঁহার এই সর্ব্ববিষয়ে নিরাসক্তি, মনের উদাসীনতা ছিল মোহগ্রস্থ ও আসক্ত মানবের পক্ষে অনেক

সাধনা ও অভ্যাস সাপেক্ষ অবস্থা। মানুষের মন সততই ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত থাকে—বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে উক্ত ভাবের প্রেরণায় তাহাকে সেই আসক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রকারেও প্রকাশিত ছিল—তিনি কোন প্রকার ঠাট্টা তামাসা ও রঙ্গ-রসের প্রিয় ছিলেন না। ছোট ছেলেমেয়েরা কোন রঙ্গ-রসের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে তাহাতে ছুটিয়া যায় কিন্তু এই সকল ব্যাপারে যোগদান করা বা অযথা ঠাট্টা তামসার ভাবে সময় কর্ত্তন করা তাঁহার মোটেই স্বভাব ছিলনা। মনে উচ্চ ভাবের প্রেরণা এবং মনে উচ্চ ভাবের লুক্কায়িত ভাব বর্ত্তমান থাকাতে তিনি সাধারণ ছেলে মেয়েদের মত চলেন নাই। কোন লোকের মনে গভীর চিন্তা খেলা করিলে সে কখনও অযথা হাল্‌কা ভাবের ঠাট্টা তামসায় মজিতে পারে না এবং কাহারও মনে উচ্চ ভাব না জন্মিলে সে কখনও গম্ভীর ভাব পোষণ করিতে পারে না। মনের আভ্যন্তরীণ গতি অনুযায়ী লোকের বাহ্যিক প্রকৃতি নিরুপিত হইয়া থাকে। তাই তিনি খেলা-ধূলায় দর্শক সাজিয়া, রঙ্গ-রসের বিষয় হইতে পৃথক থাকিয়া নিজ উদাস মনে বিচরণ করিতেন।

বাল্যকালে ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ খাওয়া দাওয়ার জিনিষের প্রতি লোলুপ হইতে দেখা যায়—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনের গঠন ছিল তাহার বিপরীত। তিনি যে কোন ভোগ্য

বস্তুকেই তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখিতেন। তাঁহার এতাদৃশ ভোগ্যবস্তুতে উদাসীনতা চিন্তাশীল লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহা গবেষণার বস্তু হইত এবং ভাবুকজন হয়ত ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইত। তদীয় বাল্যকালে কেহ যদি তাঁহাকে কোন সুস্বাদু খাদ্য খাইবার জন্য অনুরোধ করিত, তাহাতে তিনি লোলুপ হওয়া দূরের কথা বরং তাহাতে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন ও অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। কোন ভাল কাপড় বা পোষাকের কথা উত্থাপন করিলে তিনি জ্ঞাপন করিতেন "যে কোন কাপড়েই চলিবে"। একদা তাঁহাকে কাপড়ের পাড় পছন্দ করিবার জন্য বলাতে সাদাপাড়ের কাপড় ভাল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সামাজিক প্রথা মতে উহা অপরিণিতা বালিকার পক্ষে অমঙ্গল উক্তি বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন আশৈশব পবিত্র ও নিরাসক্ত ছিল এবং জাগতিক বিষয়-ভোগে তাঁহার মনের এতাদৃশ নির্লিপ্ততা যে তাঁহার মনের কি প্রকার উচ্চ গতি-নির্দ্দেশক ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

খাদ্যাদি গ্রহণে তাঁহার স্বাভাবিক রুচি ও সাত্বিক স্বভাবের পরিচায়ক। তিনি কোন প্রকার রজঃ গুণোদ্দিপক খাদ্য—মৎস্য মাংসাদি গ্রহণ করিতে চাহিতেন না—লঘু-পাচ্য সাত্বিক গুণবিশিষ্ট খাদ্যই ছিল তাঁহার প্রিয়। শৈশবে

কতিপয় বৎসরের ভিতর মধ্যেও তিনি মৎস মাংস পছন্দ করেন নাই এবং নবম বর্ষ বয়সে বৈধব্য দশায় উপনীত হওয়ার পরও তিনি কেবল সাত্বিক আহার গ্রহণেই রুচি জ্ঞাপন করিতেন। স্বভাব ও মনের গঠন অনুসারে খাদ্যের প্রতি রুচির তারতম্যই প্রকৃত গুণ ভেদে খাদ্য-বিচার। মনে সাত্বিক ভাব প্রবল থাকিলে স্বভাবতঃই সাত্বিক আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত সাত্বিক আহার। সাত্বিক খাদ্যাদি গ্রহণ দ্বারা মনে সাত্বিক ভাব উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক নহে, কেবল সাত্বিক খাদ্যাদি গ্রহণে সাত্বিক ভাব জন্মিবার জন্য সহায়তা হয়। সাত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্বিক আহারের পক্ষপাতী হইয়া থাকে—কিন্তু কেবল সাত্বিক আহার গ্রহণে সাত্বিকতা জন্মে না, সাত্বিকতা জন্মিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের খাদ্য গ্রহণের অভিরুচি স্বভাব-জাত সাত্বিক ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি আশৈশব নিরামিষ খাদ্য গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন—কিন্তু আমিষ আহারীকে অযথা দোষারোপ করার মত-বাদ পোষণ করেন নাই।

খাদ্যাদি গ্রহণ বিষয়ের মত সংযমিত স্বভাবের আর একটা দিকের ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত। নির্জ্জনপ্রিয়তা তাঁহার স্বভাবের অন্যতম গুণ ছিল; শৈশব ও বাল্য-জীবনেও তিনি সর্ব্বদাই নীরব-স্থানে নীরবতার সাহায্যে সময় কর্ত্তন করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই লোক-সমাগমের স্থান বর্জ্জন করিয়া চলিতেন; পারিবারিক বা সামাজিক

উৎসবাদিতে যেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে সেখানেই তিনি নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইতেন এবং নির্ব্বাচিত সঙ্গীগণ সহ কাল কর্ত্তন করিতেন। সঙ্গীয় লোকেরা অলক্ষিতে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ-জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া উৎসবাদির রঙ্গ-রস ভুলিয়া তাঁহার সহিত কালাতিপাত করিতে ইচ্ছুক হইত। নিজ বাড়ীতে কোন উৎসবাদি ক্রিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে জনৈক কায়েস্থ মেয়েলোকের সঙ্গ খুঁজিয়া লইতেন এবং তাহার আদর ও যত্নে তিনি নির্জ্জনে বাস করিতেন। এই কায়েস্থ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে সবিশেষ যত্ন করিত এবং ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। শৈশব জীবনের মাধুরীময় দিন গুলির অনেক দিন ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহার সঙ্গে কর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং লোক সমাজের অলক্ষিতে তিনি তাহার নিকট মনের অনেক গূঢ় ব্যাথার অবতারণা করিয়া ভাব-বিনিময়ের পরিবর্ত্তে ভাব-লাঘবতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি ছিল অতি প্রখর ও শোভন এবং বিত্থালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যে কয়েক বৎসর বিত্থাচর্চ্চা করিয়াছিলেন সেই সময় তিনি সর্ব্বদাই স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়া সহপাঠিদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন। এইরূপে শৈশবের মাধুরী অভিনয় করিয়া তিনি বাল্যজীবনে পদার্পন করেন।

তৃতীয়া বল্লী

বাল্যাবস্থা ও তৎকালীন পরিণয়-ব্যাপার।

"যো হন্তঃসুখোহন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভুতোহধিগচ্ছতি"॥ গীতা

মানব মনে কামনার পঙ্কিলতা না থাকিলে সেই শুদ্ধমনে সত্যের আভাস স্বতঃই জাগিয়া উঠে। যাহার মন অন্তরাত্মায় সুখ বোধ করে, বালকের মনের মত বহির্বিষয়ে লিপ্ত হয় না তাহার ব্রহ্মভাব স্বতঃই উপস্থিত হয়। দর্পণে কোন ময়লা না থাকিলে প্রতিবিম্ব সহজেই প্রতিফলিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের বাল্যাবস্থায়ই তদীয় হৃদয়-পটে সত্যের প্রতিবিম্ব স্বাভাবিক উপায়ে উদ্ভাসিত ও প্রতিফলিত হইতেছিল। তিনি বুদ্ধিবলে নহে, স্বকীয় মনের প্রেরণায় সুকোমল বাল্যকালে যে সকল কথা বলিতেন তাহাতেই তাঁহার চিত্তশুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবং কোন কোন বিষয়ে তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মত কথা বলিয়াছিলেন; অন্যান্য লোকেরা ইহাতে বিস্মিত হইয়া তাঁহার বুদ্ধিশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে, তিনি সত্যের মূর্ত্তি পূর্ণরূপে হৃদয়ে দর্শন করিয়া মুক্তির বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিবেন ইহা কেহ ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই। বাল্যকালে তিনি তাঁহার সমবয়স্ক সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া যে স্বাধীন ভাব, উদাসীন গতি, সত্যান্বেষণের

ভাব-বিনিময়ে চলাফিরা করিতেন, কথোপকথন করিতেন তাহা কেহ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার স্মৃতির অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; তিনি স্বতঃই অধীত বিষয়ে আবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্মৃতির বিশেষ শক্তির পরিচয় দিতেন—সহপাঠীদের শীর্ষস্থান অধিকার দ্বারা বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন—কিন্তু শিক্ষক বা অন্যান্য কেহই তাঁহার শক্তির পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে জহুরী না হইলে সোণার পরিচয় হয় না।

আত্মার প্রতি প্রেমাকর্ষণ জন্মিলে সাধকের মনে ভাগবতীয় ভাব-ধারার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন তাহার মনন, তাহার সাধন, তাহার কার্য্যকলাপ কেবল ভগবানের প্রসঙ্গ নিয়াই চলিতে থাকে। মনের এইরূপ ভাবধারার বলে বলীয়ান হইয়া সাধক ভগবানের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। শুদ্ধচিত্তে আত্ম-রস-ধারার স্রোত বহিতে থাকিলে ভগবৎ-ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে আরম্ভ করে এবং সেই শক্তিবলেই সাধক নানারূপ শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু সাধনার মূল চিত্তশুদ্ধি লাভ; চিত্ত শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলে, চিত্তের নির্ব্বিকার ভাব জন্মিলে, নির্ম্মল চিত্তে চির উদীয়মান রবি-রশ্মিবৎ আত্মার পরম জ্যোতিঃ স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কামনা-মেঘে আবৃত মন-গতি সেই রবি-রশ্মির দর্শন পায় না, খোঁজ পায় না। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন আশৈশব নির্ম্মল ছিল বলিয়া সত্যের অনুরাগ, সত্যের আভাস, সত্যের উপলব্ধি

তাঁহার হৃদয় গগনে শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল ও প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি নিজে নির্ম্মল চিত্ত ছিলেন বলিয়া অন্যকে চিত্ত নির্ম্মল করিবার উপদেশ দিতেন—মনে কোন চঞ্চলতার কারণ উপস্থিত না হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি নির্ম্মল ও শুদ্ধ চিত্তে স্থিরতার সাহায্যে মনের যে শান্তি ও আরাম অনুভব করিতেন তাহার কথা অন্যকে বলিতেন—কিন্তু সাধারণ মানুষের মন বাসনা বিরহিত নহে বলিয়া এত সহজেই তদ্রূপ মন-নিবৃত্তিজনিত উপশান্তি কোথায় ও কেমন করিয়া অনুভব করিবে? ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের তৎকালীন অবস্থার কথা ও তাঁহার উপদেশ কথা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও শক্তির আয়ত্ত ছিল না। মায়ের কথার ভিতর ছিল বৈরাগ্য ভাব, মায়া মোহ জাল ছেদনের আগ্রহ এবং একমাত্র নিত্য সত্য আত্মার অনুসন্ধানই মানুষের করণীয় ও বরণীয় বস্তু, জন্ম-মৃত্যুর পাশ অতিক্রম করিয়া নিত্য আত্মার সান্নিধ্য লাভ করাই একমাত্র উপায়, নিত্য সত্যের উপলব্ধি ব্যতীত শান্তি নাই ইত্যাদি। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিত্যানিত্য বিচার নিয়া, সত্যের অনুসন্ধান জনিত মানসিক গতি অবলম্বন করিয়া চলিতেন। তাঁহার মনে বিচার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ভাবিতেন মানুষ মাত্রেরই বিচার বুদ্ধিদ্বারা আত্ম-চিন্তা করা কর্ত্তব্য; এই ভব-সাগর উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে শান্তি পাওয়া যায় না; ভোগ-বাসনা উপভোগ দ্বারা শান্তি পাওয়া যায় না, বরং দুঃখের স্রোত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিচার

বুদ্ধি জন্মিলে হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং আত্মাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে—এবং অনুরাগ বলে আত্মাকে লাভ করা যায়, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, সত্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা কথা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে যখন তাহার বয়স মাত্র সাত কি আট বৎসর তখন তিনি পার্শ্ববর্ত্তী খলাগাও গ্রাম হইতে প্রাগুক্ত পার্শ্বের বাড়ীর সহচরী স্ত্রী লোকের সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে শশ্মানে এক মৃত-দেহ সৎকার হইতেছিল অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন ইহার পূর্ব্বে মৃত-দেহ সৎকার তিনি দেখেন নাই এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও ছিল না। এই বিভীষিকাময় মৃতদেহ-দহন দেখিয়া তিনি সঙ্গীয় লোকটীকে বহু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বহু তত্ত্ব-প্রশ্নের বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীয় স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "যদি এই লোক এইভাবে শেষ হয়, তবে আমরাও ত এই ভাবেই শেষ হইব"—ইত্যাদি। উক্ত স্ত্রী লোকটী একটী বালিকার মুখে এইরূপ কথা অর্ব্বাচীন মনে করিয়া বরং তাহাকে ভৎর্সনা করিয়াছিল। কিন্তু বিচার প্রবণ ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন এই দৃশ্য দেখিবার পর এই বিষয় নিয়া সতত চিন্তা করিতেছিল—বহুবিষয় ও তত্ত্বপ্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইল, তিনি জগতের অসারত্ব তখন আরো বেশীভাবে হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি বেলায় যখন তিনি শয়ন করিলেন

তখন উক্ত স্ত্রী লোকটীকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃত লোকটীর মত আমার হাত যদি পুড়িয়া যায়, পা যদি ভস্ম হইয়া যায়—দেহ যদি নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে কি রহিবে? এই মৃত লোকটীর অবস্থা ত সকলেরই একদিন ঘটিবে; মানুষের দেহ নষ্ট হইলে কি থাকিবে?—মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন তাহার কে থাকে এবং কি থাকে?" "এই দৃশ্য হইতে বিচার আরম্ভ করিয়া তাঁহার অন্তরস্থ মন সত্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হইল। তাঁহার উদাস মন, নির্ম্মল বাসনা-রহিত মন কোন পার্থিব বস্তুতেই সুখ বোধ করিতেছিল না—অনিত্য বস্তু মাত্রই তাহার বিরস বোধ হইত—এই ঘটনা হইতে তাঁহার মনে সত্যানুসন্ধান স্পৃহা প্রবলতর বেগে সমুদ্ভব হইল। তিনি বলিতেন জাগতিক কোন পদার্থই সত্য নহে, সুতরাং তাহার উপর বিশ্বাস করা চলে না। অনিত্য বস্তুর প্রতি বিরাগ তাঁহার মন জুড়িয়া বসিল। কোন সময় ঝড় তুফান আরম্ভ হইলে ঘর বাড়ী ঝড় তুফানে বিনষ্ট হইয়া যাইবার ত্রাস ও ভয় তাহার মনকে ভীত করিত ও তিনি এই ভয় ও ত্রাসের হেতু অন্বেষণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চিন্তা করিতেন। তাঁহার মনে কোন বিষয়-লিপ্সা বর্ত্তমান না থাকাতে তদীয় মন স্বাভাবিক ও সহজ গতিতে আত্মানুরাগে রঞ্জিত ছিল এবং উদাস মনে তিনি আত্ম-চিন্তাই পছন্দ করিতেন। তাঁহার মন সতত উদাসীন ভাবে বিচরণ করিত এবং অন্যান্য লোকের মত তিনি কাজ কর্ম্মে ও

বিষয় বাসনায় লুব্ধ ছিল না বলিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য উত্যক্ত করিত ; কিন্তু তাহাদের অনুরোধে তিনি বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও তাহাতে তাঁহার মন ডুবিত না—তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে যতটুক কাজ করিতেন তদতিরিক্ত কাজ তিনি করিতে ইচ্ছুক হইতেন না এবং করিতেন না।

নবম বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের পরিণয়ের সূত্রপাত হইল। বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার মনে বিভীষিকা সমুদিত হইল এবং তিনি ভীত মনে ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিন্তা করিতেছিলেন ; কিন্তু একটী অল্প-বয়স্কা মেয়ের পক্ষে বিবাহ-ব্যাপার রুচির বিরুদ্ধ হইলেও কোন প্রতিবাদ করা সম্ভব হইল না। তিনি যে মনোরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন আত্মীয় স্বজনেরা তাহার ভাব ধরিতে বা বুঝিতে সক্ষম ছিল না ও বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার অনভিরুচিকে একটা হাস্যপরিহাসের কথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সমবয়স্কাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে বিবাহ বন্ধন তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক ও ভীতিপ্রদ ; বিবাহের কথায় তাঁহার মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে ; তবু যদি সামাজিক প্রথানুসারে তাঁহার বিবাহ সংঘটিত হয় তবে যেন বিবাহের অব্যবহিত কাল পরেই তাঁহার বৈধব্য-দশা উপস্থিত হয়—যাহাতে তিনি স্বাধীনভাবে আত্ম-চিন্তায় রত থাকিতে পারেন। তাঁহার এই প্রকার উক্তি শ্রবণে আত্মীয়েরা তাঁহাকে তিরস্কার মাত্র করিয়াছিল—কেন তিনি এরূপ উক্তি করিলেন

তাহা ভাবিবার অবসর পায় নাই। কারণ তাঁহার মনোগতি বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

গীতা

অজ্ঞ-প্রাণীগণের পক্ষে যাহা (যেই আত্ম-নিষ্ঠা) নিশা স্বরূপ তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জাগরিত থাকেন অর্থাৎ অনুরক্ত থাকেন; যাহাতে (যেই বিষয়-নিষ্ঠাতে) প্রাণীগণ লিপ্ত থাকে আত্মদর্শী মুনির পক্ষে তাহা নিশা স্বরূপ। কারণ ভোগ এবং ত্যাগ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাপন্ন। যেমন আলো ও অন্ধকারের একত্র সমাবেশ সম্ভবপর হয় না তদ্রূপ তত্ত্ব-ভাব ও বিষয়-তৃষ্ণা একত্র স্থান পাইতে পারে না। বিষয়-স্পৃহা ও ভোগ-বাসনা যাহার অন্তরে তীব্র ভাবে বিরাজমান, সে কখনও আত্ম-তত্ত্ব ও ত্যাগ-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে পারে না; পক্ষান্তরে যাহার অন্তরে বিষয়-তৃষ্ণা নাই, যিনি ভোগবাসনাকে অনর্থক বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন সে কখনও জাগতিক সুখের জন্য লালায়িত হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন স্বতঃই ভোগ্য বস্তু হইতে পৃথক থাকিতে ইচ্ছুক হইত। এই জন্যই নির্লিপ্ত মনা ব্রহ্মজ্ঞ-মা "বিবাহ" কে সুখ ভোগের হেতু মনে না করিয়া ইহাকে বন্ধন মনে করিয়া ইহা হইতে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাব জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন। বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইবার পর ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের

চিন্তা-ধারা বলেই যেন তাঁহার স্বামীর সঙ্গে বস-বাসের কারণ উপস্থিত হয় নাই। তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে পরে তাহার বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তখন তিনি অল্পবয়স্কা বলিয়া নিজ পিত্রালয়েই বৎসরেক কাল অতিবাহিত করেন ; তাহার স্বামী বিদেশে কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন ; স্বামীগৃহে স্বামীর সান্নিধ্যে দুই একবার আসিবার কারণ জন্মিলেও তিনি বিভীষিকায় ভীত হইয়া চীৎকার করিতেন বলিয়া, লৌকিক প্রথায় তিনি "কালের-দৃষ্টি" দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে পৃথক রাখিয়া দিতেন। কালক্রমে ব্যাধির উপশম হইলে অথবা কাহারো কাহারো বিবেচনায় তিনি বয়স্কা হইলে এই ভীতির ভাব অপসারিত হইবে বিবেচিত হওয়াতে তিনি স্বামীর সহিত একত্র-বাসের ভাগী হন নাই। তিনি একাদশ বর্ষ বয়সে উপনীত হইলেই তাঁহার বৈধব্য দশা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী চাঁদপুর সহরে কার্য্য করিতেন—সেখানে তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন ও তাহাতেই মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার শুদ্ধ মনের একটী তথা-কথিত উক্তি জানিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। যখন তাঁহার স্বামীর রোগের সংবাদ দেশে পৌঁছিয়াছিল এবং আত্মীয়েরা তথায় যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মা উক্তি করিয়াছিলেন যে কাহারও তথায় যাওয়া নিষ্প্রয়োজন —তাঁহার স্বামীর মৃত্যু ইতিপূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছে।

শুদ্ধ ও পবিত্র মনে এই প্রকার দূরানুভূতি ও দূরদৃষ্টি সম্ভবপর।

বৈধব্য-দশা প্রাপ্তির পর ব্রহ্মজ্ঞ-মা একাধিক ক্রমে পিত্রালয়েই বসবাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পিত্রালয়ে তদীয় উদাস ও বিরাগ চিত্তের অনুকূল অবস্থায় তিনি উপনীত হইতে সক্ষম হইলেন। তখন তিনি স্বাধীনভাবে নিজ মন—গতির অনুকূল অবস্থায় বিচরণ করিবার সুযোগ প্রাপ্তা হইয়া নিজ মনোমত কার্য্যে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম কাজে বড় নিপুণা ছিলেন; চিত্রকলায় তাঁহার নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইত। রন্ধন কার্য্যে তাঁহার সুযশঃ ছিল। কিন্তু এই সকল কাজ তিনি স্বাধীন ভাবে করিতেন, কোন বাধ্য বাধকতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কাজ করিতেন না। নিজের উদাস গতিতে উচ্চ চিন্তা স্রোতে ভাসমান মন-ভাবের সঙ্গে যখন তাঁহার কোন কাজের খেয়াল জন্মিত তখন তিনি উক্ত কাজগুলির যাহা রুচিকর বলিয়া মনে করিতেন তাহাতে লিপ্ত হইতেন—এবং যখন তাহার ইচ্ছা জন্মিত না তখন কাহারও অনুনয়েও কোন কাজ তিনি করিতেন না বরং বিরক্তি বোধ করিতেন এবং অধিকাংশ সময় নিজ ভাব-স্রোতেই ডুবিয়া থাকিতেন।

সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার তীব্র অনুরাগ ছিল। তিনি প্রায় সময়েই তত্ত্ব-ভাবের গান সমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং নিজ মনে সেগুলি গাহিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেন। কোন ভাবের গান গীত হইলে তাহাতে তিনি আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন।

গ্রামে যে সকল শূন্য ভিটি আশেপাশে বর্ত্তমান ছিল, যে সকল শ্মশানভূমি বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে রহিয়াছিল তৎসকল নির্জ্জন স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ-মা প্রায়ই পরিভ্রমণ করিতেন এবং নিজ মনে তথায় বসিয়া ভাবের গান গাহিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। তাঁহার জন্মভূমির বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ছিল—গ্রামটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ছিল গ্রাম-বাসীরা পৌরাণিক ধরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত; তাহারা পরস্পরের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত না; তাহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞ-মা এর ভাব বুঝিত না সত্য কিন্তু তাঁহার চাল চলনে কোন বাঁধার স্বৃষ্টি করিত না। গ্রামের শূন্য বাড়ী ব্যতীত ইহাতে অনেক বন-ভূমি ও ছিল—যাহার বিহঙ্গ-নিনাদ, প্রাকৃতিক নীরব মাধুর্য্য ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের ভাব-প্রণোদিত মনে নূতন নূতন ভাব-লহরীর স্বৃষ্টি করিত। তিনি সময় সময় কোন ধর্ম্ম পুস্তক উপস্থিত মতে হাতে পাইলে পড়িতে ভাল বাসিতেন কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিয়া পুস্তক পাঠ দ্বারা উপদেশ সংগ্রহের ভাব পোষণ করিতেন না বরং পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা ঐ সকল পুস্তকে লিখিত ভাবের সমালোচনা করিতেন—এবম্বিধ ব্যাপারে তিনি তাঁহার পিসতুত ভ্রাতা অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য্যকে সহযোগী পাইতেন—তিনি সময় সময় তাঁহাকে কিছু ধর্ম্ম পুস্তকাদি আনিয়া পাঠের জন্য দিতেন এবং উভয়ে তাহা লইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। পুস্তক পাঠ তাঁহার চিন্তা-ধারার কোন সহায়ক হইত না, উহা যেন তাঁহার অবসর-বিনোদনের কার্য্য করিত মাত্র।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা বড় স্বল্প-ভাষী ছিলেন। তাঁহার গভীর ভাব-ধারার চিন্তায় তিনি সততই গম্ভীর ভাবে চলিতেন। আবার অনেক সময় কোন কথা প্রসঙ্গে তিনি হাস্যরসে মজিতেন এবং তখন তাঁহার হাসির-ফোঁয়ারা এত প্রবল ভাবে চলিত যে হয়ত বা—কয়েক ঘণ্টা যাবৎই তিনি কেবল হাসিতে থাকিতেন। তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নিন্দা পোষণ করিতেন না কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিলে তাহা সমালোচনা করিয়া এক হাস্য-রস ধারার সৃষ্টি করিতেন। তখন সঙ্গীয় লোকেরা তাঁহাকে একজন সহযোগী বলিয়া মনে করিত; কিন্তু পরক্ষণেই এরূপ কোন কারণ-ধারা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া হাস্য-পরিহাসের রস অনুভব করিতে যাইয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিত—এবং তখনই আবার তাহারা বুঝিত যে ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহাদের মন-ভূমিতে বিচরণ করিতেন না। তিনি নিজ মনে যখন এই জগতের অসারতত্ব চিন্তা করিতেন, প্রকৃতির ভাব-রসে মজিয়া নিবিষ্ট চিত্তে থাকিতেন তখন কেহই তাঁহার ভাব-ধারার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাহস পাইত না।

স্বাধীন পন্থানুসরণ ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্য এক বিশিষ্ট উপাদান। তিনি ধর্ম্ম-চিন্তায় অন্য পুস্তকাদির সহায়তার দরকার বোধ করেন নাই এবং অন্য কর্ত্তৃক চালিত পথে তাঁহার মনন ও তাঁহার চিন্তা চলে নাই। তিনি জগতের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে নিস্কৃতি লাভের পন্থা সততই খুঁজিয়া লইতেন—কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বিচার বিহীন অবস্থা মোটেই

পছন্দ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকিলেও তাহা নিজ আত্মারূপীই হইবে; নিজকে বাদ দিয়া অপরের ভজনা দ্বারা শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এই ধারণা তাঁহার ছিল না। সত্য শান্তি কিভাবে পাওয়া যায় এই ছিল তাঁহার স্বাধীন চিন্তা-ধারা। ধর্ম্ম-সাধনার কোন বাঁধাধরা মত তিনি গ্রহণ করেন নাই। কেহ তাঁহার ধর্ম্মের কোন বাহ্যিক প্রণালী ও প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই। কেহ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে তাঁহার পন্থা কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বাধীন-চিন্তার কথাই উল্লেখ করিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে মানুষ প্রকৃতির এতাদৃশ দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা তত্ত্ব মোটেই বুঝিবার প্রয়াস করে না এবং স্বাধীন ভাবে তত্ত্ব-বুঝিতে চেষ্টা করে না; মানুষ অভ্যাসের দাস ও সংস্কারের ক্রীড়া-পুতুল হইয়া স্বাধীন চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছে। এই জন্য ধর্ম্মের এত আড়ম্বর, ধর্ম্মের এত বাহ্যিক নিয়ম-প্রণালী ও অন্যাদিষ্ট পথে ধর্ম্ম সাধনার এত আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তত্ত্ব-বিচারে ইহাই স্বীকার্য্য হয় যে পরম ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ সত্তা এবং ইহার সগুণবাদ কার্য্যকারণ হেতুতে প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া সগুণ উপাসনা এবং প্রার্থনা-বাদের অবতারণা হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ অচিন্তনীয়—সুতরাং তাঁহাকে ভাবিতে হইলে সগুণ ভাব আরোপ পূর্ব্বক নাম ও রূপের সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে—হিন্দুশাস্ত্র পূর্ণায়তন

স্বরূপে ব্রহ্মের এই দুই সত্তাই স্বীকার করিয়া থাকে এবং ঈশ্বরের নাম চিন্তণীয় বলিয়া তাহার কল্পিত রূপেরও পক্ষপাতী। অন্যান্য শাস্ত্রবাদ বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সগুণ সত্তাকে অস্বীকার করিতে যাইয়া রূপের কল্পনা বাদ দিয়া নাম গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া গত্যন্তর না পাইয়া সগুণ বাদ স্বীকার না করার চেয়ে অধিকতর সগুণ-পন্থীর পরিচয় দিয়াছে এবং জাগতিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হইয়া সগুণ বাদের একটা কিম্ভূত কিমাকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। মায়াবাদীরা জগতের নশ্বরত্ব মানিয়া নির্ব্বাণ ও মুক্তির সাধনাই একমাত্র স্বীকার করেন—পক্ষান্তরে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রশ্ন যেখানে বিদ্যমান সেখানে পরম ব্রহ্মের সগুণ-বাদ ও সগুণ-সাধনা গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং নাম রূপ উভয়ের সহায়তায় ঈশ্বর-প্রাপ্তির প্রণালী নির্দ্দেশ ক্রমে ভক্তি-বাদের মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"। গীতা

অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবেই হউক যাহারা আমাকে (ঈশ্বরকে) যে ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেভাবেই গ্রহণ করি এবং অনুগ্রহ করি; মানুষ আমাকে বহুবিধ রূপেই ভজন করিয়া থাকে।" সুতরাং ইহা দেখা যায় যে সগুণ ব্রহ্মের রূপ ও নামের কল্পনা দ্বারা তাহাকে উপাসনার যে প্রণালী বর্ত্তমান আছে তাহা দ্বারা বিভিন্ন সাধক, মনের গঠন ও বুদ্ধিশক্তির

তারতম্য অনুসারে ঈশ্বরকে বিভিন্ন ভাবে ভজনা করিয়া গন্তব্য স্থলে পৌছিতে পারে। গতানুগতিক পন্থায় ঈশ্বরকে ভজনার প্রণালী নির্দ্দেশ করিলে মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ধারার-পথ অবরুদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব, স্বাধীন হওয়া—মুক্ত হওয়া—প্রকৃতির বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা। ব্রহ্মজ্ঞ মা বলিতেন যে মানুষ স্বীয় রুচি ও বুদ্ধি বলে ঈশ্বরকে ভজন করিবার স্বাধীন ভাব খুঁজিয়া লইলে সাধকের পক্ষে সাধনা অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তিনি বিচার প্রণালীতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া ঈশ্বরকে পৃথক ভাবে কল্পনা না করিয়া আত্মা রূপে ভজনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রণালী ও স্তর মানিয়া বাহ্যিক পূজা অর্চ্চনাতে নাস্তিক বুদ্ধি আরোপ না করিলেও চিন্তা এবং মনন সাহায্যে ঈশ্বর প্রাপ্তির আবশ্যকতা বেশী অনুভব করিতেন। যাহারা উচ্চ সাধনার পথ খুঁজিয়া পায় নাই তাহারা পূজা ও অর্চ্চনার সাহায্যে ক্রম-গতিতে আত্মানুসন্ধানে অগ্রসর হইবে ইহা স্বীকার্য্য হইলেও মুক্তির-পথ এবং ধর্ম্মের প্রণালী বিচার ও চিন্তাশীলতার উপরই নির্ভর করে এই অভিমতই ব্রহ্মজ্ঞ-মা পোষণ করিতেন। স্বাধীন প্রণালী তাঁহার সহজ গতি ছিল—কোন বিধি নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না।

"বেদ বিধির নিষেধ মানা কিছুই সে শুনে না—
হৃদয়ে তার আরাম খানা, সোণা রূপা ভাবে ছাই।"

যাহারা এতাদৃশ উচ্চ সাধনার অধিকারী নহে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ধরিয়া চলিতে বাধ্য হয়—কিন্তু চিত্ত উদাস ভাবাপন্ন ও অনুরাগপরায়ণ না হইলে আত্মানন্দের রস ধারা বহিতে পারে না এবং সাধক আত্ম সাধনায় বিমল আনন্দ পায় না। "বিনা অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ-যাগ তোমায় কি যায় জানা।" ব্রহ্মজ্ঞ-মা—এর মন 'আত্মানুরাগে ভরপূর ছিল বলিয়া তিনি বাহ্যিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম সাধনা করেন নাই এবং বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রণালী তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি ধর্ম্ম সাধনার জন্য বাহ্যিক বেশ ভূষা গ্রহণ করা এবং এমন কি স্বকীয় মনের স্বাধীন গতি খর্ব্ব করিয়া দীক্ষা গ্রহণাদি ও মন্ত্র-গ্রহণাদিতেও আস্থাবান ছিলেন না। মানুষের মনে যখন বিবেক সমুদিত হয়, মানুষ যখন ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হয় তখনই তাহার দীক্ষা প্রাপ্তি হয়; নতুবা অন্য কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে কোন নিয়ম পালন দ্বারা মন্ত্র জপ করিলে দীক্ষার ফল লাভ হয় না। ধর্ম্ম তত্ত্ব বুঝিবার যে আগ্রহ ও বুদ্ধি মানব মনে জাগরিত হইয়া তাহাকে আত্ম-রসে অনুপ্রাণিত করে তাহাই দীক্ষা। বাল্যাবস্থার পর হইতে মানব হৃদয়ে সমস্ত বৃত্তিরই ক্রমঃবিকাশ হইতে থাকে। নিজ চেষ্টাবলেই হউক অথবা অন্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট উপদেশ বলেই হউক যখন মানব-মন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ বুঝিতে আরম্ভ করে ও বিশ্বের মূল-তত্ত্ব জানিতে আরম্ভ করে তখন তাহার ধর্ম্ম বিষয়ে

দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং অনুরাগের বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল বাহ্যিক প্রণালীতে দীক্ষা গ্রহণের মতবাদ ব্রহ্মজ্ঞ-মা শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেন না—কিন্তু তাহা লইলেও লৌকিক প্রথার অযথা নিন্দা করার ভাবও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। মনে দীক্ষার অঙ্কুর বিকশিত না হইলে বাহ্যিক দীক্ষা গ্রহণে ফল পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি বৈধব্য দশা প্রাপ্তির কিছু কাল পরে কুল-গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু সে দীক্ষাগ্রহণ মাত্র লৌকিক মতের সমর্থন ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করার অসামর্থতা বশতঃই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহাতে তাঁহার উচ্চ ভাব-প্রবণতার কোনরূপ সার্থকতা পরিদৃষ্ট হয় নাই এবং তিনি নিজের-কথা জ্ঞাপন স্থলে বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা তাঁহার মনে কোন ক্রিয়া হয় নাই এবং তিনি ইহার কার্য্য-প্রণালী অনুসরণ করেন নাই—কেবল লোকের গঞ্জনা এড়াইয়া চলার উদ্দেশ্যে নিজের মতামতের কোন পরিচয় দেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে এই দীক্ষা গ্রহন কার্য্যে তাঁহার মত উচ্চ ভাবুকের প্রাণে ধর্ম্ম-ভাব জাগরণের বা ধর্ম্ম-সাধনার সহায়তা না হইলেও এই সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কাহারও ক্ষতি হয় না ইহা প্রমাণের জন্যই যেন তিনি স্বকীয় ভাব গোপন রাখিয়া এই কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কাহাকেও বাহ্যিক প্রণালী মতে দীক্ষা প্রদান করেন নাই। তাঁহার উচ্চ ধর্ম্ম-তত্ত্ব বাহ্যিক আকারে

বিতরণের জিনিষ ছিল না। কেহ তাঁহার ভাব তত্ত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক বা সমর্থ হইলেই তাহার দীক্ষা প্রাপ্তি হইত। "যোগঃ চিত্ত—বৃত্তি নিরোধঃ"—চিত্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তিগুলিকে এক কেন্দ্রস্থ করার নাম যোগ। মনের বৃত্তিগুলি বাসনা বশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া চলে। বলপূর্ব্বক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া রহিত দ্বারা এই মনের বৃত্তিগুলিকে দমন করা যায় না। মনে বিচার বুদ্ধি জাগরিত হইলে এবং মনে ঈশ্বরানুরাগ প্রবল হইলে বিক্ষিপ্ত মনের বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি বা মানসিক ভাবগুলি একত্র সন্নিবেশিত হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ মা আমাদিগকে যোগ সম্বন্ধে এই আধ্যাত্মিক অর্থই বুঝাইয়াছেন। এই যোগ-সূত্রের ব্যাখ্যানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন যে সহজ গতিতে ও স্বাভাবিক ভাবে একাগ্র হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ তাঁহার মন বাসনা দ্বারা জড়িত ছিল না—তিনি উদাস মনে বিচার বলে মনকে সহজেই সংযত করিতে পারিতেন এবং মনের স্থিরত্ব সাধন দ্বারা মনে অপূর্ব্ব আত্ম-রস আস্বাদন করিয়া দিন কর্ত্তন করিতেন। তাঁহার মনের স্থিরত্ব সাধন এত সহজ গতিতে জন্মিত যে অনেক সময় তিনি তাহা নিজেই বুঝিতেন না এবং স্বকীয় ভাব দ্বারা চালিত হইয়া অন্যের মনগতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। অনেক সময় তিনি তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রশ্ন করিতেন "তোমরা কি অনেকক্ষণ একস্থানে বসিয়া থাকিলে মনের তন্ময়তা

অনুভব কর না? স্থির হইয়া একমনে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেই ত একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হয়; মনের শান্তভাবে মানসিক অপূর্ব্ব আনন্দ-রস মনকে ভরপূর করে ইত্যাদি—" তখন তিনি এতদূর বুঝিবার প্রয়াস পান নাই যে মানুষের মন বিষয়-রসে ডুবিয়া থাকায় তাহাদের মন স্থির হইতে পারে না—তাহাদের বিচার বুদ্ধি জাগে না। মানুষ যে অস্থিরমনা এই জ্ঞানও অনেকের নাই এবং অস্থির মনকে সংযমিত করার জন্য মানুষের বহু অভ্যাস ও সাধনার দরকার।

ধর্ম্ম, সাধনা তাঁহার স্বাভাবিক গতি ছিল। ধর্ম্মের সাধনায় তাঁহার কোন প্রয়াস করিতে হইত না। মানুষ দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ধর্ম্ম সাধনা করে ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মন কোন ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মাচরণে ও আত্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট হয় নাই। তিনি নিজ স্বাভাবিক মন-গতির বশবর্ত্তী হইয়াই আত্ম-চিন্তা করিতেন—ধর্ম্ম চিন্তাতেই তাঁহার মনের রসানুভূতি হইত। তিনি ভাবিতেন মানুষের মন বিষয়-বাসনার জন্য, ভোগের জন্য ইচ্ছুক ও অভিলাষী বলিয়া আত্ম-কথা ভাবে না—ইচ্ছা হইলেও মানুষের লুব্ধ পঙ্কিল মনে আত্ম-চিন্তা জাগরিত হওয়া যে বহু সাধন-সাধ্য তাহা তিনি তাঁহার তৎকালীন মানসিক ভাব দ্বারা বুঝিতে প্রয়াস পান নাই। খেলার জিনিষের প্রতি বালক বালিকার যে প্রকার আসক্তি, সংসারের লোকের ভোগ্য বস্তুর প্রতি তদ্রূপ আসক্তির

বেশী কিছু আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার মনে অন্য বিষয় চিন্তা ভাল লাগিত না এবং আত্ম-চিন্তাই তাঁহার প্রিয় বস্তু ও সুখকর ছিল বলিয়া তিনি যেমন বাসনা কামনার পথে রস অনুভব করিতেন না তদ্রূপ মানুষ বিষয় বাসনার পথে রস অনুভব করে বলিয়া আত্মকথার আত্ম-চিন্তায় প্রয়াসী হয় না—কিন্তু ইচ্ছা জন্মিলে মানুষ সহজে আত্ম-চিন্তায় ডুবিতে পারে। মানুষের মন যে তীব্র বিষয়-বন্ধন জনিত রসানুভূতিতে মোহগ্রস্থ থাকাতে আত্ম-চিন্তায় ডুবিতে পারে না—চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বাসনা জাল হইতে সহজে সংযমিত করিতে পারে না ইহা তিনি ক্রমশঃ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব জন্মার্জিত মনের সংস্কার মানুষের মনভূমির স্তর ও গতি নির্দ্দেশ করে এবং গুণভেদে মন সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন হয়। এই গুণত্রয়ের তারতম্যই বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

চতুর্থী বল্লী

যৌবন-দশা ও তৎকালীন মানসিক গতি।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের শৈশব ও বাল্যজীবন এই প্রকার উদাস-ভাবের গতিতে অতিক্রান্ত হইলে পর তিনি যৌবনের বৎসরগুলি গণিতে আরম্ভ করিলেন। যৌবন জীবনের সর্ব্ব প্রকার বৃত্তির স্ফূর্ত্ত অবস্থা, এই সময় মানবের শরীর ও মনের সর্ব্ববিধ শক্তি ও ভাব বিকশিত হইয়া থাকে; যাহার যেরূপ মনের গঠন তাহার বৃত্তিনিচয় সেভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া স্ফূর্ত্ত ও বিকশিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অপূর্ব্ব মন-গতি ও ভাব-প্রভা ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তবিনোদনে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার চিরন্তন উদাসীন মানসিক গতিকে অবলম্বন করিয়া তিনি দিন দিন আত্ম-রস-ধারায় নিমজ্জিত হইলেন। ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণের একমাত্র রস-সম্পদ ছিল—কিন্তু অন্যান্য লোকেরা তাঁহার ভাবের অনুসন্ধান পাইত না। তিনি বলিতেন "যত রাখিবে গুপ্ত তত হইবে শক্ত"। ধর্ম্মভাব বাজারের জিনিষের মত অন্যের নিকট প্রকাশিত হইলে তাহার মূল্য কমিয়া যায়, তাহার শক্তির হ্রাস সাধন হয়। ধর্ম্মভাব হৃদয়ের গূহায়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার জিনিষ--তাহার বাহ্যিক প্রকাশ নিষেধ বলিয়া সকলেই উপদেশ দেন। কিন্তু মানুষ যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মকে আত্মপ্রিয় বস্তু বলিয়া বুঝিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহার তাহা গুপ্ত রাখার

সর্ব্ব-বিধ প্রয়াস জন্মিতে পারে না। মানুষের মন যশের আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মকে অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া যশঃ আহরণ করিতে কুন্ঠিত হয় না। যশঃ-প্রিয়তা মানুষের মনকে তুর্ব্বল করিয়া তোলে এবং সে ভাবে মানুষ ধর্ম্মকে যে পর্য্যন্ত প্রাণের জিনিষ বলিয়া ধরিতে না পারে সে পর্য্যন্ত সে যশের ফাঁকিতে পড়িয়া অমূল্য ধর্ম্মভাব চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে পাইবার জন্য সরল প্রাণে ব্যাকুল হয়, সে চায় ধর্ম্ম-সম্পদ বৃদ্ধি করিতে, সে ভুলেও ধর্ম্মের কথা আত্ম-কথা প্রকাশ করিয়া নিজ ধর্ম্ম-ভাব নষ্ট করে না। সে অর্থ-গৃধ্নু লোকের মত তাহার ধর্ম্ম-ভাণ্ডার লুকাইয়া রাখে। ব্রহ্মজ্ঞ মা চিরদিনই তাঁহার অমূল্য ধর্ম্ম-ভাব লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই সময় ব্রহ্মজ্ঞ মা অধিকাংশ সময়ই তাঁহার পিত্রালয় বিতারা গ্রামে নিজ মনের উদাস গতিতে দিনাতিপাত করিতেন এবং সময় সময় স্বামীর গৃহ পুটিয়া যাইয়া বসতি করিতেন। নিজ গ্রামে বসবাসের সময় তাঁহার স্বাধীন গতি ও স্বাধীন চিন্তাধারা পূর্ব্ববৎ অব্যাহত ছিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বাস করিতেন সত্য কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনের কোনও প্রকার বন্ধন পরিলক্ষিত হইত না। তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কোন সময় কোন গৃহকর্ম্ম করিতেন কিন্তু মনের উদাস ভাবে কোন সময় তাঁহার

গৃহকর্ম্মাদির জন্য আসক্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত না এবং অন্যের অনুনয়েও কোন কাজে লিপ্ত হইতেন না। সূক্ষ্ম কার্য্যাদি—চিত্রকলা, সেলাই-কর্ম্ম' বাঁশের বুননকর্ম্ম তাঁহার বিশেষ রুচিকর ছিল এবং সকল কাজে তাঁহার নিপুণতা ও বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হইত। তিনি কোন কোন সময় এই সকল কার্য্যে প্রতিযোগী হিসাবে নিযুক্ত হইতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দিগকে পরাস্ত করিয়া সুন্দর নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন। কিন্তু এই সকলই ছিল তাঁহার অবসর বিনোদনের কর্ম্ম। তিনি সর্ব্বদাই উদাস ভাবে থাকিতে চাহিতেন। উদাস মন-গতিই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। উদাশীনতা মনকে যে রস ও আনন্দ দান করে তাহা উদাসী লোক ব্যতীত অন্য লোকে বুঝিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ মা বলিতেন যে বিষয়াসক্ত লোক উদাসীনতার মর্ম্ম কিছুতেই বুঝিতে পারে না— তাহারা ভাবে যে উদাসী লোক ভবঘুরে লোকের মত অলস ও অকর্ম্মা; কিন্তু মনকে বিষয়-বাসনা হইতে শূন্য না করিতে পারিলে উদাসীন ভাব উপস্থিত হয় না। অনুরাগ এবং উদাসীনতা একই বিষয়-বিরাগ-চিত্ততার নিদর্শন। মন বিষয়-বাসনার রসে ডুবিয়া থাকিলে উদাসীনতার আনন্দ লাভ করিতে পারে না। উদাসীনতার ন্যায় ধর্ম্ম সাধনে তাঁহার স্বাধীন গতি ও নির্ভীক-চিত্তের বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মসাধনে কোন নির্দ্দিষ্ট মত বা পথ মানিয়া চলা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সুখের আশায় ধর্ম্ম-কাজ করিবার ভাব পোষণ

করেন নাই, বরং ধর্ম্ম-সাধন তাঁহার স্বভাব-গত কর্ম্ম ছিল। মানুষ প্রথম ধর্ম্মকাজে অগ্রসর হয় এই ভাবিয়া যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম দ্বারা নিত্য-সুখ ও স্বর্গ-সুখ পাওয়া যায় এবং অধর্ম্ম-পন্থানুসরণে পরলোকে অশান্তি পাইতে হয়। কিন্তু এই প্রকার বিচার হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব পরিচালিত হয় নাই। শান্তি সুখের ভাবেই তাঁহার আত্ম-চিন্তা চলিত এবং এই আত্ম-চিন্তার পথে তিনি নির্ভীক ভাবে চলিতেন। তাঁহার চিন্তা-ধারা ছিল বিচার-মূলক। বিচার ও উদাসীনতা তাঁহার সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি নিত্যানিত্য বিচার ও মৃত্যু-চিন্তা বলেই মনের সংযম-যোগ পাইয়াছিলেন এবং আভ্যন্তরীণ চিন্তা-ধারার ভাবে রস-বিভোর চিত্তে দিনাতি-পাত করিতেন। তিনি অনিত্য বস্তুর চিন্তাকে ভীষণ ভয়াকারে প্রদর্শন করিতেন এবং উদাহরণ স্বরূপ একদা উক্তি করিয়াছিলেন "যদি কোন লোক কাহাকেও প্রচুর সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিয়া বলে যে তুমি ইহা স্বচ্ছন্দে খাও, তারপর সম্মুখস্থ খড়গ দ্বারা তোমাকে বধ করা হইবে, তবে কি সেই ব্যক্তির সেই খাদ্যের প্রতি কোন আসক্তি বা রুচি থাকিতে পারে?" চিন্তা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে জাগরিত হইলে অনিত্য বিষয়-রসে মন ধাবিত হইতে পারে না। তাঁহার অন্য একটী উক্তি হইতে তাঁহার ব্যাকুলতার তীক্ষ্ণ ভাব প্রকাশিত দেখা যায়। "যদি কোন কৃপণ ধন-লিপ্সু জনের অর্থের থলিয়া (Money bag) জলে পড়িয়া যায় এবং তখন পশ্চাৎ হইতে অন্য লোকে তাহাকে ডাকে বা অন্য ভাবে লুব্ধ করে, তবে কি সেই কৃপণ ব্যক্তি তাহার থলিয়া না উঠাইয়া

অন্যের কথায় কর্ণপাত করে ? তদ্রূপ আত্মাই একমাত্র আনন্দময় এবং আত্মাই একমাত্র সত্য এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে বিষয়-চিন্তা স্বতঃই দূরীভূত হয়।" তিনি বিচার ও বৈরাগ্যের এতাদৃশ জ্বলন্ত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন । বিচার অর্থে উহাকে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলে হইবে না শুদ্ধমনে সত্য তত্ত্ব জানিবার জন্য যে বিচার উপস্থিত হয় ব্রহ্মজ্ঞ মা সেই বিচারেরই পক্ষপাতি ছিলেন—শুধু পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি-বিচার বলে আত্মোপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মনের গঠন ছিল অপার্থিব।

"নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ।
তস্য আত্ম-জ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥

—অষ্টাচক্রসংহিতা—

যাহার মন বাসনা-বিহীন ও উদাসীন সেই আত্মানুরাগী জনের তুলনা জগতে মিলে না। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মন ছিল শুদ্ধ, বিষয়-বাসনা বর্জ্জিত ; তিনি বস্তুর প্রকৃত বিচার করিতেন এবং সেই বিচারের ভাবরাশি তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ় হইত যে তাহাতে তাঁহার মনের ক্রম-বিকাশ সহজ গতিতে চলিত।

"বিচারাৎ জায়তে যো বোধঃ স অনিচ্ছা সত্ত্বেঽপিন নিবর্ত্তয়েৎ পঞ্চদশী" সত্য বিচার দ্বারা যে বোধ জন্মে তাহা চিরসত্যে পরিণত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মনের চিন্তা-ধারা মানসিক গতি এবং ভাব-প্রবণতা এতাদৃশ বিচারের উৎস সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনে অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দের রস-ধারার রচনা করিত।

পাক-প্রণালীতে তাঁহার নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার স্বহস্ত-কৃত পাকের খুব প্রশংসা ছিল। তিনি এই সকল কাজে উদাস ভাবেই জড়িত হইতেন; বাধ্য-বাধকতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কার্য্যই করিতে চাহিতেন না। এই বয়সে অনেক সময় তিনি নিজের খাদ্য নিজেই পাক করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতেন। তাঁহার খাদ্য যে সাত্বিক শ্রেণীভুক্ত ছিল ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লোভ ও নির্লিপ্ত ছিলেন। শরীর রক্ষার্থ সাধারণ খাওয়া দাওয়া নিয়াই তিনি চলিতেন এবং উপবাসাদির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কোন সময় কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কোন সময় খাওয়ার ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তিনি উপবাস করিয়া দিন কাটাইতেন—কখনও বা দুই চারি দিন উপবাসে যাপিত হইত এবং ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া পড়িত। তিনি খাওয়া পরার ব্যাপারে এতাদৃশ অবহেলার ভাবে চলিতেন বলিয়া তাঁহার শরীর যে রুগ্ন হইয়া পড়িত তাহার নিদর্শন আমরা পরে অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘন ও অযথা উপবাস করার প্রবৃত্তি তাঁহার দেহকে পূর্ব্ব হইতেই রোগের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। চিন্তাশীল লোকোত্তর মহাপুরুষদের জীবনে দৈহিক কার্য্যাদির প্রতি এতাদৃশ অবহেলা ও ঔদাস্য বর্ত্তমান থাকিতে পরিলক্ষিত হইলেও অনেক মহাপুরুষের সেবাকারী লোক তাঁহাদের

যত্ন সেবা দ্বারা সে অভাব পূরণ করিয়া থাকে—কি ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের লোকচক্ষুর অন্তরালে উদ্‌যাপিত জীবনে কার্য্যকলাপ অন্যের নিকট তত ধরা পড়ে নাই এবং সেইজন্য তিনি দেহের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া চলিতেন এ উপবাস তাঁহার এক অভ্যাস-গত কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল তিনি বহুসময় বহুদিন একাধিক্রমে উপবাস করিয়া শরীরে কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন এবং কোন এক সময় তিনি একাধি ক্রমে দ্বাবিংশ দিন উপবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলি আমরা জানিয়াছি। মন যাহাদের শরীরের প্রবৃত্তির বহির্গ এবং ভোগ বাসনার দ্বারা পরিচালিত নহে তাহাদের জীবনে স্বাস্থ্য বিধি উল্লঙ্ঘনের বহুবিধ কারণ সমুদিত হইতে পারে কি ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের তীব্র উদাসীন ভাবে পরিচালিত জীব অপরাপর লোকের পক্ষে তাঁহার যত্ন ও সেবা গ্রহণে সম্ভাবনা না থাকায় ত্বদীয় স্বাস্থ্য যৌবন কাল হইতেই রোগে বাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার গতিবিধি তাঁহ জনসঙ্ঘের প্রতি বীতস্পৃহতা ও স্বাধীন ভাব-প্রিয়তা তাঁহা সকল সময়ই অন্যের দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়াছিল। তাঁহ ইচ্ছাকৃত কার্য্য-নিপুণতা দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার গু বহু প্রশংসা করিত এবং তাঁহার উচ্চ-ভাব হৃদয়ঙ্গম করি না পারিলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করিত।

বিংশতি বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিবার পর ব্রহ্মজ্ঞ মা মানসিক উদাসীনতা ও চিন্তার প্রগতি প্রবলতর

চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি রাত্রিবেলা নিশীথ সময়ের নিস্তব্ধতার ভিতর বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী ফুল বাগানে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইতেন—কখন কখন কোন শ্মশান ভূমিতে পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি প্রায় সময় একাকীই মধ্য-রাত্রির নীরব নিস্তব্ধ ভাবকে বাহিয়া লইয়া শ্মশান-প্রায় নীরব স্থানে বসিয়া আত্ম-চিন্তা করিতেন এবং নিশীথ কালের নীরবতা তাঁহার খুব প্রিয় ছিল বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। কোন কোন আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহার সে সন্ধানের অনুসন্ধান লইয়া তাঁহার সঙ্গে শ্মশান ভূমিতে ভ্রমণে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সহগামী হইত কিন্তু তাহাদের সেই ইচ্ছা আত্ম-চিন্তা জনিত ভাবে পরিচালিত হয় নাই বলিয়া তাহারা কখন কখন ভীত হইয়া চলিয়া আসিত এবং কতক দিন তাঁহার সঙ্গে চলাফেরার আনন্দ উপভোগ করিয়া বিরত হইয়া পড়িত। ব্রহ্মজ্ঞ মা নির্জ্জনতার ও নীরবতার এত প্রিয় ছিলেন যে সুযোগ পাইলেই সে ভাবে সময় কর্ত্তন করিতেন এবং আত্ম-চিন্তা রসে অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন। নীরব স্থানে আত্ম-চিন্তা-রসের তন্ময়তায় বিভোর হইয়া তিনি কখন কখন সঙ্গীয় কোন কোন লোককে সেই রস আস্বাদনে ডাকিতেন ও উপদেশ দিতেন। কিন্তু বিষয়-রসে চঞ্চল চিত্ত সঙ্গীরা সেই আনন্দের ভাব বুঝিত না এবং ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের কথাগুলিকে অবান্তর বাজে কথা বলিয়া গণ্য করিত। বাস্তবিক কোন লোক সম-ভাবের ভাবাপন্ন না

হইলে তাহাকে সে কথা বলা নিরর্থক। কোন বিদ্ব ব্যক্তি তাহার কাব্য-রস-ধারা একজন নিরক্ষর লোকে বলিতে গেলে সে তাহা বুঝিবে কেমনে?, যদি কোন লো সঙ্গীতের রস অনুভব করিতে না পারে, তবে কোন সঙ্গীতজ্ঞ তাহার নিকট সঙ্গীতের রসের ব্যাখ্যা করিলেই বা কি ফ হইবে? তদ্রূপ বিষয়-নিস্পৃহ আত্ম-রস-প্রিয় ভাবুকের ম যে চিন্তারাশি জাগিয়া উঠে, যেই ভাবে তাহার মন সত বিচরণ করে, যে, ঔদাস্য ও অনুরাগ তাহার চিত্তকে বিনোদ করে, যে ভগবৎ প্রেম ঐশ্বর্য্য তাহার মনোরাজ্যের সম্প হইয়া উঠে তাহা অজ্ঞান অন্ধকারে ঘূর্ণীয়মান বদ্ধজীবে নীরস প্রাণে কখনও স্থান পাইতে পারে না।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্ত মোহেন চিত্তম্।" কঠোপনি

বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন বালকসদৃশ অজ্ঞ লোকের নিক তত্ত্ব-কথা স্থান পায় না। বাস্তবিক বিবেক ও বিচার ব চিত্ত শুদ্ধি না জন্মিলে তত্ত্ব-রস কাহারও প্রিয় হইতে পারে না চিত্ত-শুদ্ধি-লাভ ধর্ম্ম-সাধনার প্রথম ও প্রধান সোপান। ব্রহ্ম মা স্বভাবগত উদাসীন ভাবে বিচরণ করিতে করিতে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে পর তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব্ব রহ আত্মভাবের বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল। সে ভাব কার্যে গূঢ় অর্থ লোক-বুদ্ধির অগম্য হইয়া তাহা দ্ব্যর্থ ব্যাখ্যা পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার অসীম আত্ম-ভাব-ধারার স্ফু

তাঁহাকে লোকের বুদ্ধিতে মনসা-দেবী আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

একদা ব্রহ্মজ্ঞ মা তাঁহার পাক-পাত্রগুলি পুষ্করিণীতে ধৌত করিতেছিলেন—তখন অলক্ষিতে তাঁহাকে একটি সর্প দংশন করিয়াছিল; সর্পের বিষ তত সাংঘাতিক হইবে না ভাবিয়া তিনি তাহা প্রথমে কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহার সংজ্ঞা লোপের সূত্রপাত হইলে পর তিনি ঐ ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলেন এবং তদনুসারে সর্প-বৈদ্য আসিয়া সেই বিষ-ক্রিয়া নষ্ট করিয়া তাঁহার আরোগ্য বিধান করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনা হইতে তাঁহার মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পুনরায় সর্প তাঁহাকে দংশন করিলে কি হইবে এই ভাবিয়া মৃত্যু-চিন্তার বশে নহে, শুধু আতঙ্কের ভয়ে, তিনি সর্প ভীতিতে সন্ত্রস্ত ভাবে চলিতে লাগিলেন। এই ভাবনা তাঁহার শুদ্ধ মনে এক রহস্যজনক ক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। তিনি একদিন সর্পাঘাতে আক্রান্ত না হইয়াই সর্প-বিষে জড়িত অবস্থার মত সংজ্ঞাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন আত্মীয় স্বজনেরা মনে করিল যে তিনি নিশ্চয়ই সর্পাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন সুতরাং সর্প-বৈদ্য ডাকা হইলে সে বিষ অপসারিত করিল। ইহার কয়েক দিন পরে একদা তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "ঐ সর্প আসিতেছে, আমাকে দংশন করিল" এবং পর মুহূর্ত্তে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় বন্ধুরা যাহারা

নিকটে ছিল তাহারা কোন সর্প দেখিতে পাইল না। কি
তাঁহার শরীরে সর্প দংশন জনিত রক্ত-পাত দেখিতে পাইল
ইহাতে সর্প-বৈদ্যের সহায়তা পূর্ব্ববৎ নেওয়া হইল এ
তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল। কতক দিবস পরে পুনরা
তিনি একদিন চিৎকার করিলেন "সর্প আসিতেছে ঐ স
আমাকে দংশন করিতেছে, আমাকে ধর ইত্যাদি।" এ
শব্দগুলি তাঁহার স্বজন বন্ধুদের কর্ণে প্রবেশ করা মা
তাহারা সর্পের অনুসন্ধান করিয়া কোন সর্পের চিহ্ন
দেখিল না—কিন্তু তাঁহার শরীরে সর্পাঘাত জনিত রক্ত-পাত
তৎসঙ্গে তাঁহার সাময়িক মূর্চ্ছা প্রত্যক্ষ করিল। সে দি
সর্প বৈদ্যের সহায়তা গ্রহণ করা হইল না—কতক সময় প
তিনি নিজেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্যান্য লোকে
তাঁহার সর্পাঘাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি কে
উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ কোন ক
বলিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ইহার কয়েক দিন পরেও পূর্ব্বব
সর্পাঘাতের ব্যাপার চলিল এবং আত্মীয় স্বজনেরা এই সম্বন্
কোন সঠিক ধারণা করিতে সমর্থ হইল না এবং এই সিদ্ধা
করিলেন যে তিনি কোন দৈব-শক্তির প্রভায় এই ভাবাশ্রয় প্রা
হইয়াছেন এবং তদবধি তাহারা তাঁহাকে মনসা-দেবীর ভাবাশ্রি
মনে করিয়া তাঁহাকে মনসা-সিদ্ধা বলিয়া অভিহিত করিল। ত
সকলেই তাঁহার পূত-চরিত্রে বিশ্বাসবান হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনা
যথাযথ ব্যাখ্যা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি মনসা-দে

অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছেন বলিয়া মনে করিল এবং সর্প ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অধিষ্ঠিত ঘরে দুধ-কলা রাখিয়া দিত; কোন কোন সময় তিনি সর্পের আগমন চীৎকার দ্বারা জানাইবার পর প্রদত্ত দুধ-কলার ও নিঃশেষ দেখা যাইত।

এতাদৃশ দৈব-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে পূর্ব্ব-সময় হইতে অধিকতর শ্রদ্ধা ও ভীতির চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিল। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞ-মা নির্জ্জনে নিজ স্বাধীন ভাবে থাকার সুযোগ অধিক পরিমাণে পাইলেন। তাঁহাকে পৃথক ঘরে একাকী থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল—এবং স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহার খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করিবার প্রয়াস করা হইল। কিছু দিন পরে "সর্পের আগমন" জনিত ব্যাপার স্থগিত হইল—কিন্তু তথাপি লোকেরা তাঁহাকে মনসা-সিদ্ধা বলিয়া ধারণা করিল এবং তাঁহার সঙ্গে সেই ভাবে ব্যবহার করিতেছিল। কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার স্বামীর বাড়ী পুটিয়া গ্রামে গমন করেন এবং প্রায় দুই বৎসর সেখানে বসতি করেন। তখন সেখানের আত্মীয় স্বজনেরা ও বিতারার ঘটনা শ্রুত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে মনসা-সিদ্ধা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাঁহার থাকার জন্য পৃথক ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—কেহ কেহ তাঁহাকে "সিদ্ধ" ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-মা ছিলেন ভাবুক সাধক; বাহ্যিক আড়ম্বর তাঁহার নিকট নিতান্ত নিরর্থক ও বৃথা প্রতীয়মান হইত। তিনি নিজ মানসিক গতির ও চিন্তাধারার সুযোগ মাত্র এই

কার্য্যের ভিতর খুঁজিয়া লইয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত নি
মানসিক গতির অসাধারণ স্ফুরণকেও তুচ্ছ করিয়া পূর্ব্বব
লোকের নিকট আড়ম্বর-বিহীন ভাবে চলিতে লাগিলেন। তি
অন্যকর্তৃক আরোপিত কোন আড়ম্বর বা প্রশংসার ভাবকে তু
করিয়া কেবল নিজ ভাব গোপন রাখিয়া বাহ্যিক ঘটনার কিছু
পোষকতা করেন নাই—অন্যান্য লোকের নিকট সর্পাঘাত জনি
ঘটনাদির মূল-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক হই
তৎসকল যে মিথ্যা তাহাই বলিতেন। তিনি এই সম্বন্ধে কে
প্রশ্ন শুনিলে নিরুত্তর থাকিতেন এবং প্রশ্নকারীকে এই সকল
কথার অন্বেষণ না করিয়া সরল ও বৈরাগ্যবান হইতে উপদে
দিতেন এবং কিসে মানুষ প্রকৃত শান্তি ও সুখের অধিকা
হইতে পারে তাহার চিন্তা ও মনন করার জন্য বলিতে
ব্রহ্মজ্ঞ-মা সর্পাঘাত জনিত ব্যাপারের রহস্য আমার নিকট বি
পীড়াপীড়ির বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করেন; তখন আ
ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের পীড়িত শরীরের অসুস্থতার উপশম বিধানে অ
হইয়া "হাওয়া বদলে" দার্জ্জিলিং জেলায় কার্সিয়াং নগরী
ছয় মাস বাস করিয়াছিলাম। তখন আমি তাঁহার জীব
ঘটনা সমূহের যথা-সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলা
তিনি তখন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সাধনার গূঢ় রহস্য কি
পরিমাণে উদ্ঘাটন করিবার জন্য "ষট-চক্র" আখ্যা ন
কতকগুলি সাধন-তত্ত্ব আমাদ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলে
তখন তাঁহার মনের গতি আমাদের জন্য এত স্নেহযুক্ত ছিল

আমরা কোন আবদার করিলে তাহা রক্ষার জন্য ইচ্ছুক হইতেন। এই জন্যই আমি "সর্পাঘাত" জনিত ঘটনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণের অধিকারী হইয়াছিলাম। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিলেন— "মানুষের মনের একাগ্রতার ফল অসীম। মানুষের মন বিষয়-বাসনায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে—মনে বিষয়-লিপ্সা প্রবল থাকায় মানুষ মনকে একাগ্র করিয়া কিছু চিন্তা করিতে পারে না ভাবিতে পারে না। একাগ্র মনে কোন বিষয়ে মনের চিন্তা প্রবাহিত হইলে তাহার অপূর্ব্ব ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্পাঘাত কালে আমার মনের গতি অত্যন্ত একাগ্র ছিল—এরূপ একাগ্রতা বহু সাধন ও অভ্যাস যোগ-সাধ্য ব্যাপার; মন একাগ্র হইলে সাধনার অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং একাগ্র মনের সহায়তায়ই সাধক অন্তর্জগতের বিভূতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। তখন আমার মন এত একাগ্র ছিল যে আমি ইচ্ছাক্রমে মনের একাগ্রতা ভুলিতে পারিতামনা। ইহার ফলেই আমার সর্পাঘাত জনিত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। যখন পাক-পাত্র পরিস্কার করিবার সময় আমাকে সর্প দংশন করিয়াছিল তখন এই সর্প ভীতি আমার প্রাণে এত সন্ত্রস্তভাব বিস্তার করিয়াছিল যে সেই কল্পনা আমার মনে সূক্ষ্মভাব হইতে স্থূলভাবে পরিণত হইল—সর্প ভীতির কথা স্মরণ হইবামাত্র আমার মন সর্পের প্রতি সন্ত্রাসে একাগ্র হইয়া পড়িত; তখন একাগ্র মনের শক্তিতে আমি সর্প স্থূলাকারে অবলোকন করিতাম—তখন আমার সর্প দংশনে মৃত্যু হইবে এই ভয় উদিত

হইত না কেবল সর্প আসিবে এই ত্রাসে ভীতি ও তৎসহযোগ একাগ্রতা বলে সর্প দংশন ও সর্পদর্শন প্রত্যক্ষ হইত। সর্প আসিবে এই আতঙ্কে সর্পচিন্তার কথা ভাবিয়া আমি সর্প দেখিতাম ও চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতাম ইহাতে মনের ক্রিয়া বশতঃ বাহ্যিক ক্রিয়াদি হইত। কিন্তু এই সর্প দংশন জনিত ব্যাপার তিন মাস কাল ধরিয়া চলার পর আমার এই বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুতা জন্মিল এবং সূক্ষ্ম বিচার ও অনুসন্ধানের পর আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার মনের ক্রিয়াই এই রহস্য বিস্তার করিয়াছে।

কারণ এই চিন্তাবলে বলীয়ান হইয়া আমি সর্পের আগমন চিন্তা করার সঙ্গে সর্পদর্শন একটু সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লওয়াতে দেখিলাম যে আমার প্রত্যক্ষীভূত সর্প জ্যোঃতির্ম্ময় আকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে; সর্প তাহার স্বাভাবিক আকারে পরিদৃষ্ট না হইয়া কেন জ্যোঃতির্ম্ময় আকারে দেখা গেল এই ভাবনা বলেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে সর্পভীতিতে সন্ত্রস্তভাবে চলিতে চলিতে এই সর্পদংশন ও সর্পদর্শন আমার নিজ মন-ক্রিয়া দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। এই বিচার দৃঢ় হওয়ার ফলে আমার এই সর্পদংশন ঘটে নাই এবং সর্পদর্শন যে মনের শক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রমান করার মানসে আমি একাগ্র মনে অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে তাহাই অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সাধক নিজ মনের একাগ্র কল্পনা দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তি

দর্শন করিতে পারে ও ইষ্টদর্শন জনিত প্রেমানন্দরসে বিভোর হইয়া থাকে—এই ব্যখ্যা আমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিলাম। সাধক বহু সাধক লব্ধ একাগ্র মনের বলে ও অসীম অনুরাগের শক্তিতে একম্বিধ-রূপদর্শন করিবার অধিকারী হয়। কিন্তু এই প্রকার রূপদর্শন ও সাধনার সীমা নহে—ইহা দ্বারাও খাঁটী সত্য ও শান্তি লাভ হয় না এই বিচার সমুদিত হইয়া আমার মন বেশীদিন এই অবস্থায় স্থিতি করে নাই। যে সাধকের মনে বিচার প্রবল সে এই প্রকার রূপ-দর্শনাদি বিভূতি-লাভের আধকারী হইয়াও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না—তাহার মন চায় চির শান্তি।"

এই সময় ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবনে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জন্মিয়াছিল তাহাকে যৌগিক সাধনার ভাবে বলে মনিপুর চক্রের অবস্থা—সাধক জীবনে জ্যোঃতি দর্শনের অবস্থা—ভগবানের রূপ-দর্শনের অবস্থা। সাধক বহু সাধনার ফলে মনের যে গতি লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের স্বাভাবিক মন-গতির বিকাশের সঙ্গে প্রকটিত হইল। তিনি ছিলেন বিচার পরায়ণ; তিনি অধ্যাত্ম-রাজ্যের মূলে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি কোন প্রকার মূর্ত্তি পূজা করা, কোন বাহ্যিক বিধি নিষেধ মানিয়া চলা, কোন বাহ্যিক আকারে তপ যপ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজ জীবনে এই সকল বাহ্যিক ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার মত বিচার প্রবল সাধকের পক্ষে বাহ্যিক পূজাদির আবশ্যকতা ছিল না

বলিয়া তিনি সর্ব্ব সাধারণের জীবনে এই সকল অনুষ্ঠানে সার্থকতা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি সততই বলিতে যে যাহাদের মন সহজে নিয়ন্ত্রিত হয় না, সংযম সাধন যাহাদে পক্ষে সহজ গতিতে উপস্থিত হয় না, বিষয়-বৈরাগ্য যাহাদে স্বাভাবিক গতি নহে, তাহারা নিয়মাদির অধীন হইয়াই চলিবে জপ তপ সাধন করিবে।

কার্য্য ও কারণ একই ভাবেরই স্ফুরণ-ভাব সূক্ষ্মাকারে কারণরূপে এবং স্থূলাকারে কার্য্যরূপে পরিণত হয়। কার্য্য কারণের এই প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন কার্যে প্রণালী অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে একই ফল লাভে হেতুভূত কারণ বিভিন্ন মুখী হইয়া চলিতে পারে। সাধনার গ বহু প্রকার হইতে পারে কিন্তু সাধনার ফল এক সত্য বস্তু নির্দ্দেশ করে। সাধনা মূলতঃ এক ভাবাপন্ন হইলেও প্রকৃতি বৈচিত্রে তাহা বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ও সামর্থ্যের গণ্ডি সাধনার পথ বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু সকল সাধনা মূল সত্যলাভ—ঈশ্বর প্রাপ্তি। বর্ত্তমান যুগ-শ্রেষ্ঠ মহাপুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই বিষয় সমাধান কল্পে উপদেশ দিয়াছে "যত মত তত পথ।" কিন্তু সাধনার বাহ্যিক প্রণালী বিভি হইলেও উহারা যদি উদ্দেশ্য সাধনে ফলপ্রসূ হয় তবে তৎপ্রণালী অনুষ্ঠেয়—কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি প্রয়োজন সাধ অর্থাৎ আত্ম-রসানুভূতির আনুকূল্য সাধনে সহায়ক হইলেই তা পালন দ্বারা সাধক উন্নত হইতে পারে। কিন্তু অনেক ধ

সম্প্রদায় আছে যাহাতে বাহ্যিক প্রণালীর জন্য এত গোড়ামী ও বাধ্য-বাধকতা বর্ত্তমান যে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলিকেই ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহাতে ধর্ম্মের মূল-ভাব তাহাদের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ-মা ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বিশ্বাসবান ছিলেন না—তিনি আত্ম-চিন্তা এবং তৎসহায়ক বিষয় নিস্পৃহতা, উদাসীনভাব, বিচার-শক্তি বলেই মুক্তি লাভ করিয়াছিলে। তাঁহার মত উচ্চ সাধকের পক্ষে বাহ্যিক নিয়মাদির বাধ্য-বাধকতা নিরর্থক। মালা-তিলক ও বেশভুষণাদি গ্রহণ নিম্নস্তরের ধর্ম্ম-সাধকের পালনীয় বস্তু এবং উহারা ও ধর্ম্ম-রসানুভূতির সহায়ক না হইলে, ভাব-তন্ময়তা উৎপাদনে অসমর্থ হইলে, মনের অনুরাগ উৎপাদন করিতে না পারিলে, তাহাদের অনুষ্ঠানে কোন সার্থকতা নাই—তাহাতে ধর্ম্মাড়ম্বরের চিহ্ন সূচিত হয় মাত্র। প্রত্যক্ষ-দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ হইতে মূল্যবান। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিরূপ অনাড়ম্বর ও সরল জীবন-যাপন-গতিতে তাঁহার মনের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং কিরূপে তিনি সত্য বিচার সাধনের বলে মুক্তিতত্ব অবগত হইয়া নিজ জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ-মনে ব্রহ্ম-জ্যোঃতি দর্শন করিয়া সাধনার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ মগ্ন হইলেন। তিনি নির্জ্জন ভাব-প্রিয় ছিলেন এবং সে ভাবের সহচর হইয়া আত্ম-চিন্তায় কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতি র্জন সংসদি।" গীতা

মহাপুরুষদের চরিত্রে ও স্বভাবে ভাব-প্রবণতার বাহ্যিক গতি এই ধারায়ই চলিয়া থাকে—ভাবুক সাধক তাহার আত্ম-তত্ত্বে পোষকতার জন্য এভাবে চেষ্টিত হয়। যে ভাবাঙ্কুর তাহার চিত্তে বিনা আয়াসে জন্মিল তাহার ফল দর্শনে আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিব।

পঞ্চমী বল্লী।

সাধনার সূত্র-পাত ও ক্রম-বিকাশ।

" অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥" গীতা

যাহার বুদ্ধি সর্ব্ব বিষয়েই অনাসক্ত, যিনি নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ তিনি সন্ন্যাস দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সের প্রারম্ভে তাঁহার সাধনার আভ্যন্তরীন রস-ধারা ও মাধুর্য্য মূর্ত্তাকারে প্রকটিত হইল। সাধনার বলে সাধক অন্তর-রাজ্যে যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও রহস্য অনুভব করিতে থাকে তাহা বাহ্যাকারে প্রকাশের জিনিষ নহে তাহা ধ্যান-গত চিত্তে উপলব্ধি ও অনুভবের বস্তু; সাধন-জগতে ভ্রাম্যমান সাধক যে সমস্ত রসানুভব করিতে সামর্থ হয় মাত্র; অন্য সাধারণ অজ্ঞ লোকের নিকট তাহা ধারণার বস্তু ও হয় না। মহাপুরুষেরা তাঁহাদের ভাব কণার গূঢ় রহস্য লোক-কল্যানের জন্য প্রচার করিবার অভিলাষী হইলে তাহাদের মুখ বিনিঃসৃত অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতা শ্রবণ করিয়া সাধারণ মানব তত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা করিবার প্রয়াস পায় কিন্তু সে প্রয়াসের দ্বারা তত্ত্ব-রসাস্বাদন জন্মে না— কেবল মানচিত্র দেখিয়া পৃথিবীর আকার ধারণা করার মত ধারণা-শক্তি লাভ করিতে পারা যায়। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃতবাক্যাবলী সহযোগে তাঁহার জীবনের সাধন-রহস্য সম্বন্ধে

যৎ সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সাধনার আভাস দিতে পারিব মাত্র—কিন্তু সেই ভাব, সেই রহস্য, সেই আনন্দ ভাষার পারিপাট্যে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না—সে কেবল নিজ সাধন লভ্য অনুভবের জিনিস। সেজন্য শাস্ত্রকারগণ সাধন-রহস্য গুরোপদেশ-গম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাধারণতঃ সাধক যে পন্থা ও প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে এবং আত্মদর্শন লাভ করে বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, সেই পন্থা সম্পর্কীয় তত্ত্ব কথার সম্যক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা সত্য তত্ত্ব অনুসন্ধান তৎপরতার ক্রম বর্দ্ধমান প্রক্রিয়াকে সাধন-প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে অদ্বয়? আত্মার সাধনা কেন বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয় এবং এক ঈশ্বরের উপাসনা কেন বহু আকারে লোক সমাজে প্রচারিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। সৃষ্টি বিচিত্রতাময়—বিশ্বে এই বৈচিত্রের সমাবেশ আছে বলিয়া আত্মার অভিনয় ও অনন্তমুখী হইয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ, যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ ও তাহাদের কার্য্য কলাপ সৃষ্টি বৈচিত্রের ও বিভিন্নতার পোষকতা করিতেছে। সৃষ্টি মানব মাত্রই বিভিন্ন ভাব পরিপোষণ করে এবং এই জন্যই সাধনার মূল উদ্দেশ্য এক হইলে ও বিভিন্ন মানবের রুচি ও সংস্কার অনুসারে সাধনার পথ বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়াছে। তত্ত্বানুসন্ধানকারী মানুষের ভিতরও এই কারণেই জ্ঞানী, যোগী ভক্ত ও কর্ম্মী এই চারি শ্রেণীর সাধকের নাম বিভিন্নভাবে পরিগণিত হইয়াছে। জ্ঞানপন্থী সাধক এই জগতের

মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া জাগতিক পদার্থনিচয়কে মিথ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া সত্য আত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হয়—তাহাদের মতে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং সৃষ্ট-প্রাণী ও সৃষ্টি তাহারই রূপান্তর আরোপিত বস্তু। ভক্তিপন্থী সাধক এই সৃষ্টিরহস্যের সত্তাকে স্বীকার করিয়া তাহার একমাত্র নিয়ন্তা ভগবানের উপলব্ধিকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে—ভগবানের সান্নিধ্য পরমাগতি ও চিরন্তন সত্য বলিয়া স্বীকার করে। যোগী এই পঞ্চ ভূতাত্মক সৃষ্টির বিশ্লেষণ দ্বারা আত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় এবং আত্ম-দর্শন লাভ করিয়া পরম শান্তির অধিকারী হয়। কর্ম্ম-পন্থানুসরণকারী সাধক বিশ্বের মূলে এক ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়া ভেদাভেদ ভুলিয়া জগতের হিতের কর্ম্ম প্রেরণায় নিজ ক্ষুদ্র অহমিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সৎকর্ম্ম সাধনায় নিযুক্ত হয় এবং চিত্ত-শুদ্ধি বলে বিভিন্ন কর্ম্ম পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তপঃ যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের ভজনা করিয়া থাকে ও চরম সত্যে উপনীত হয়। সাধনার এই বিভিন্নমুখী গতি অনুসারে বিভিন্নসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রদায় বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে সাধক যেরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ও যেরূপ মানসিক শক্তিতে শক্তিবান সে তত্তুল্য ভাবময় সাধকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনে দীক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন-ভাবপরিপোষকতার ভিতর কোন সত্য প্রিয় সাধকই অন্য সম্প্রদায়কে হিংসা ও বিদ্বেষের ভাবে দেখিতে পারে না। নিজ নিজ ভাব পোষকতা

করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণকারী সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া অন্যসম্প্রদায়ের প্রতিকূলতা করিবে না এবং প্রেম ধর্ম্ম বন্ধনে সত্যকে বরণ করিয়া অসত্যের পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই কাম্য বস্তু জগতের হিত-সাধন এবং নিজ নিজ মুক্তিলাভ এবং এই উদ্দেশ্যনিচয়ে পরিচালিত ভাবুক সাধকের প্রাণে অসত্যভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। বিশ্বের মৈত্রী বিধানেই তাহার মন নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবনে যে আত্মসাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত অদ্ভূত রহস্যময় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন আশৈশব উদাসমনা—তাঁহার চিত্ত ছিল ভাব প্রবণ এবং বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ বিচার সম্পন্ন। তাঁহার সাধনা ছিল ভাব সাধনা। তিনি সাধনার ক্ষেত্রে কোন বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন নাই। শ্রেণীভেদে অভিহিত করিতে হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী—সাধক বলিয়া গণ্য করা চলে কিন্তু তাহা হইলেও বিভিন্ন সাধনার ভাব ও রহস্য তাঁহার সাধনায় মিশ্রিত দেখা যায়। তিনি শঙ্করাচার্য্য পরিচালিত বিচার প্রণালী নিজস্ব সম্পদ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের আত্মবিশ্লেষণ ও বিশ্বমৈত্রীর ভাব এবং নির্ব্বাণতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণের অপরিসীম বৈরাগ্য ও প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া শান্তিলাভের

ইহাই হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রচারিত বহুমতের ঐক্য স্থাপন শুদ্ধধর্ম্ম ভাব প্রচারের প্রচেষ্টাকে তিনি যুগাবতারের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রামতীর্থ, তুলসীদাস প্রভৃতি সাধুদের জীবন উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন মুক্ত পুরুষ মাত্রই এক অদ্বয় ? আত্ম-রসের সম অধিকারী ; জীব জগতে প্রতিষ্ঠিত কার্য্যকলাপে মুক্তপুরুষদের সম্বন্ধে বিভিন্নভাব প্রতিপোষকতা কেবল জনসমাজের ভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে কোন ভাবে বৈরাগ্য পরিলক্ষিত হইলেই তাঁহার চিত্ত-বিমোহন হইত তিনি অমূলক বিষয়ে বৈরাগ্য লাভের জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন। বিষয় তৃষ্ণাই মনের বন্ধন ইহা তাঁহার চিরন্তন উক্তি ছিল। তিনি বলিতেন আসক্তিই বন্ধন, আসক্তিই অজ্ঞানতা আসক্তিই সংসার ; আসক্তি বিহীন মনে তত্ত্বভাব বিস্তার লাভ করে। তিনি অনুরাগী সাধু লোকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। অনুরাগ বিহীন আড়ম্বর প্রিয় সাধুদিগকে তিনি উচ্চস্থান দিতেননা। ত্রিপুরা জেলার অন্যতম সাধু মনমোহন দত্তের প্রেমিকতা উল্লেখ দ্বারা তিনি বাহ্যিক আড়ম্বর প্রিয় সাধুদের আচরণের সমালোচনা করিয়াছিলেন। সাধন জগতে কোন কপটতা, ভাণ ও বিষয় বুদ্ধির পরিচয় পাইলে তিনি তৎসকল ভাবকে সাংসারিক ভাব হইতে ও হীনজ্ঞান করিতেন। সংসারী নিষ্ঠাবান লোকের ভাব, কপট সাধুর ভাব হইতে শ্রেয় ও প্রেয় এই কথা তিনি উপদেশচ্ছলে অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধন-

জগতে সিদ্ধি শক্তির কোন দৃষ্টান্ত বা কার্য্য কলাপের কথা শ্রবণ করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন এবং সিদ্ধি শক্তি প্রচারে মত্ত সাধুদের আচরণে ব্যথিত হইয়া তিনি বলিতেন "অবিচারে দেশ গেল।" অর্থাৎ ধর্ম্ম সাধনায় সরল অনুরাগের অভাব বশতঃ যে সকল সিদ্ধি শক্তির প্রচার পরিদৃষ্ট হয় তৎসকল মানব সমাজেকে কলুষিত করে এবং যে সকল মানুষের তত্ত্ব বিচার শক্তি নাই তাহারাই এই সকল বিষয়ে প্রশ্রয় প্রদান করে এবং খাঁটী ধর্ম্ম পিপাসার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। ধর্ম্মের নামে কপটতা, ধর্ম্ম না করার চেয়ে ও দোষনীয় ইহা ছিল তাঁহার সরল উক্তি। সত্য ধর্ম্মের সাধনা ও ভাল, তবু প্রকৃত ধর্ম্মের পোষকতা হয় না এরূপ আড়ম্বর তুচ্ছ ও হেয়।

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের চিত্ত ছিল উদাসী—বুদ্ধি ছিল বিচার পরিচালিত—মন ছিল আত্মানুরাগী। তাহাতেই তিনি স্বল্প সময়ের ভিতর আত্মবিকাশের পথে বহু অগ্রসর হইয়া চলিবার ক্ষমতা আহরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "জ্ঞান পথে বিচরণকারী সাধকের মন খাঁটী বিচার বলে সহজে ও স্বাভাবিক গতিতে তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকে।" তাঁহার সাধনার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি জ্ঞান পথকেই সমুচিত উচ্চ স্থান দিতেন এবং জ্ঞান পথের প্রশংসা করিতেন। বুদ্ধদেবের মত তিনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান আহরণ করিবার পথ স্বাধীন চিন্তাবলে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন

ভগবান বুদ্ধ ইহজগতের দুঃখ ও ত্রিতাপ সন্তাপ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় উদ্ভাবন করিলেন—বাসনা কামনাই জীবকে দুঃখ কষ্টে জড়িত করিয়া রাখে। জীবাত্মা সেই কামনাকুহক ছেদনে সমর্থ হইলে নির্ব্বাণ লাভ করে শান্তির অধিকারী হয় কিন্তু বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ সত্তার সূত্র উল্লেখ করেন নাই; যেহেতু তাঁহার ভাবনা ছিল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। বৈদিক হিন্দুশাস্ত্র নির্ব্বাণ সত্তাকে পরম ব্রহ্মের নির্গুণ আনন্দময় সত্তা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে এবং তাহাদের সাধনা সেই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ মাও বলিতেন বাসনা ও আসক্তিই বন্ধন ইহারাই জীবের স্বাধীনতা বা মুক্তির পরিপন্থী। যদি মন বিষয় বিনির্ম্মুক্ত হয় কামনার জাল ছিন্ন করিতে পারে তবেই পরমা গতিলাভ হয়—পরমা গতিকে লক্ষ্য করিয়া বাসনা ছেদন যে কথা, বাসনা ও কামনা দুঃখের হেতু অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া একই কথা। বিচার প্রবণ নিরাসক্ত-মনা ব্রহ্মজ্ঞমা ধর্ম্ম কথার প্রসঙ্গে দুঃখের নিবৃত্তির জন্য বাসনা কামনা ত্যাগই উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন কিন্তু তাঁহার ভাবনা যে উদাসীন গতির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল তাহা সাধারণ লোকের মন গতির পক্ষে দুরূহ ছিল বলিয়া জানিতে পারিয়া তিনি ভক্তি-মিশ্রণ জ্ঞানই অপর সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি তাঁহার জীবনে উপাসনা কিংবা ভজনার গতি অবলম্বন করিবার হেতু অনুভব করেন নাই। তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন

শান্তি ও মায়াতীত অবস্থা এবং অনুভব করিয়াছিলেন "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অবস্থা যাহা আচার্য্য পরমহংসাবতংস শঙ্কর বিচার ও শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শঙ্কর বেদোক্ত হিন্দুশাস্ত্রের মৌলিক সূত্র ধরিয়া মুক্তির মত ও পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলতঃ মহাপুরুষদের আচরিত ও নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম -সাধনা এক শাশ্বত অদ্বয় সত্তারই অনুভূতি ও উপলব্ধি।

চিত্তের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞ মা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে প্রনোদিত হইয়া অন্তর্জগতের রহস্য সকল অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সকল তত্ত্ব-ভাব ও অন্তর রাজ্যের সত্যানুভূতি আমাদের ধারণার বহির্ভূত বিষয়। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কথার ভাবে ও জ্ঞানে সে সকল সত্যের আভাস কতক পরিমাণে ধারণা করিবার সৌভাগ্য আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। যখন তিনি সর্প দংশন জনিত ব্যাপারে নিবিষ্ট ছিলেন তখন তিনি একদিন অনুভব করিলেন "আমি ভাবে তন্ময় হইয়া পড়ার পর একদা আমি অনুভব করিলাম যে আমি যেন সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় শরীরে জীব-জগৎ সমন্বিত সংসারের বহির্ভাগে উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছি জীব-জগৎ আয়নার উপর প্রতিফলিত প্রতিমূর্ত্তির মত টল টল ও চঞ্চল অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইতেছিল আমি যেন জীব জগৎ হইতে পৃথক ভাবে উচ্চ ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি; তখন আমার যে জ্যোঃতি অনুভব হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়—যে আনন্দ অনুভূত হইল তাহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে ইত্যাদি।"

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মনের গতি সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করিবার কালে তাঁহার যে সকল উপলব্ধি জন্মিতেছিল তাহা বিভিন্ন সাধকের পক্ষে বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে এই জগতে বিষয়ানুভূতি যেমন বিভিন্ন প্রকার অনুভূত হয় এবং এই জগতের বিষয়ানুভূতি যে প্রকার মনের কল্পনা দ্বারা জন্মিয়া থাকে, অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম আনন্দানুভূতি ও তেমন মনেরই বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রকমের অনুভূতি, সুতরাং বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন প্রকারে অন্তর্জগতের রহস্য সমূহ ও সত্যানুভূতি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যে সকল সাধক ইষ্ট মূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন তাহারা অন্তর রাজ্যের আলোকে চিত্ত আলোকিত দেখিতে পাইলে যে প্রকার দর্শনাদি উপলব্ধি করে আত্ম ধ্যানে নিমগ্ন সাধকের অনুভূতিসকল তাহা হইতে পৃথক ভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্যোঃতি দর্শনাদি অবস্থা লাভের পর আত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন সাধক নিজ মূর্ত্তি আকাশে ভাসমান অবস্থায় উপলব্ধি করে—ভক্ত সাধক তাহার ইষ্ট মূর্ত্তি জ্যোঃতির্ম্ময় ভাবে অনুভব করে ও পরিদর্শন করে তাঁহার তৎকালীন আত্ম-রসানুভূতি মনের গঠনের অনুযায়ী ভাবে অনুভূত হয়। জ্ঞানী সাধক এই জ্যোঃতিদর্শনাদি অবস্থায় জগতের পৃথকত্ব, অসারত্ব উপলব্ধি করে এবং নিজ ভাবে নিজ আত্ম-মূর্ত্তির রসাস্বাদন করিতে থাকে; এই অবস্থায় ভক্ত সাধক ঈশ্বর দর্শন লাভে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া আনন্দে বিভোর হয়

অন্তর্জগতের ভাবে নিজকে গড়িয়া তুলিতে থাকে ; ভক্তির-ভাবে প্রণোদিত হইয়া ভগবানের জ্যোঃতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত, পুলোকিত, ও আনন্দ-রসে বিভোর-চিত্ত হইয়া চলিতে থাকে। তখন সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভের জন্য প্রয়াসী হইয়া অন্তর্জগতের সাধনায় লীলা-রস অনুভবে কাল কাটাইতে থাকে। সাধন-জগতের ভাবে সাধকের এই অবস্থাকে মনিপুর চক্র-ভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সাধক এই ভাবে বিচরণ করিবার সময় অপরূপ রূপ-রস লাভে বিভোর হইয়া পড়ে। ভক্ত ভগবানের বিভিন্ন প্রকারের রূপাদির দর্শন স্পর্শন দ্বারা চিণ্ময় ধামে বিরাজ করিতে থাকে। জ্ঞানী সাধক এই অপূর্ব্ব আনন্দময় অবস্থা লাভ করিয়া আত্ন-রস-ধারায় নিমজ্জিত হয়। সাধক সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মভাবে বিভোর হইতে থাকে। তখন তাহাদের হৃদয় রাজ্যে কতই না অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় সুখ ও শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে; তখন তাহাদের মন কতই না ভাব কেলিতে বিভোর হইয়া রস-ধারার পর রস-ধারার স্বজন করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু চিরন্তন শাস্বত সত্য লাভ না করা পর্য্যন্ত মৃত্যুকে জয় করা যায় না, পরমগতি পাওয়া যায় না, শাস্বত আনন্দ অনুভূত হয় না। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুং আপ্নোতি য ইহ নাশেব পশ্যতি।" কঠোপনিষৎ রূপ রসের অতীত নামরূপের অতীত নিগুর্ন সত্তাকে উপলব্ধি না করিলে সাধনার চরম অবস্থা লাভ হয় না অদ্বৈত শান্ত শিবকে না জানা পর্য্যন্ত পূর্ণ সত্য লাভ হয় না। কাজেই অন্তর-রাজ্যের

কপাট যে সাধকের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মন বিভিন্ন ভাবে উচ্চ হইতে উচ্চতর গতিতে এবং স্থির হইতে স্থিরতর ভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া চলিতে থাকে। এই অন্তর রাজ্যের রস-বিলাসে ও মায়া-বিজৃম্ভিত জীব-জগতের রসমোহের মত মোহ বর্ত্তমান আছে। এই সকল অবস্থায় মন চলিবার সময় বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন গতি উপলব্ধি হয়—তখন ভক্ত সাধক অপেক্ষা বিচার পরায়ণ জ্ঞানী সাধকের মন-গতি প্রখরতর ভাবে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি-সম্পন্ন ছিল বলিয়া তিনি অন্তর্জগতের ভাবাবস্থাগুলি অনুভব করিয়া, উপলব্ধি করিয়া একটী অবস্থার পর অন্য একটী অবস্থায় বিচরণ করিতে করিতে ছয় বৎসর কালের মধ্যে মহৎতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া পরমা মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন পূর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্ম-ভাব ঃ "ব্রহ্মাহমস্মি" এই কথার পূর্ণ আভাস আমরা তাঁহার কথায় পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তিনি বলিতেন "আমি আকাশ ব্যাপী বিরাট হাসি"। তিনি তাহার পূর্ণ-সত্য-লাভের ইঙ্গিতে আরো বহু কথাই বলিয়াছেন যাহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি তিনি পূর্ণ অদ্বয় ব্রহ্মকে জানিয়াছেন—সম্পূর্ণ বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সমাধির ভাব, তাঁহার সরল উক্তি, তাঁহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ এবং অনুভূত ও উপলব্ধ বাক্যাবলী তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পরিচায়ক। তিনি যে সকল অন্তর-রাজ্যের ভাব ও রস অনুভব করিয়া পূর্ণ সত্যে অধিষ্ঠিত

হইয়াছিলেন সে সকল রস-ধারার বর্ণনা,—(যাহাকে ষট্ চক্র ভেদ বলা যায়,—) আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত বিষয়। তিনি সে সকল অন্তর রাজ্যের সাধন-রহস্য সম্বন্ধে কিছু কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাহার যৎ কিঞ্চিৎ আভাস দিতে সমর্থ হইব। সাধনার গূঢ় রহস্য ও আনন্দানুভূতি কেবল সাধকেরই অনুভবের জিনিষ। সাধক ব্যতীত ঐ সকল ভাব অন্যের পক্ষে ধারণা করা ও সম্ভবপর নহে।

সাধন জগতে বিচরণকারী সাধকের মনে যখন জ্যোতিঃ-দর্শন-লাভ সম্ভবপর হয়, মনের স্থিরগতির সহায়তায় মনে একাগ্র-ভাব জন্মিলে সাধকের চিত্তের দরজা যখন খুলিয়া যায়, যখন সাধক ভগবানের রূপ দর্শনে সমর্থ হন অথবা আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শনে মোহিত হন তখন তাহার মণি-পুর-চক্রের অবস্থা-লাভ হইয়া থাকে; তৎপরে মনের স্থিরতার সঙ্গে সত্যের প্রতি অনুরাগের প্রবৃদ্ধিতে মন ক্রমশঃ স্থিরতর অবস্থা সকল অনুভব করিতে থাকে এবং অন্তরে দিব্য সত্যালোকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ধারা অনুভব করিয়া চলিতে চলিতে অনাহত, বিশুদ্ধ-চক্র; আজ্ঞা-চক্র ও সহস্রার-চক্রের অবস্থা গুলি উপলব্ধি করিতে থাকে এবং পূর্ণ সত্যে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধনার কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞ-মা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে মনের উচ্চ গতির সঙ্গে সাধন জগতে মানসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধকের যে সকল বিভিন্ন অনুভূতি ও উপলব্ধি জন্মিয়া থাকে সে সকলেরই নামান্তর হিসাবে যোগ-শাস্ত্রানুসারে ষড়-চক্র-ভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাস্তবিক সূক্ষ্ম বিচারে এই সকল মানসিক অবস্থা বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন প্রকারে উপলব্ধি করে এবং মানসিক গতির তারতম্যানুসারে সূক্ষ্ম-জগতের ক্রিয়া ও অনুভূতি বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। মনে যে সময় বিবেক বৈরাগ্যের সমুদয় হয় তখন মানুষের মন বিষয়-রস হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুরাগের বলে আত্ম-কথা আত্ম-ভাবনা, ঈশ্বর-চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। ভাবনার বলে মনের একাগ্রতা ও অনুরাগের সাহায্যে সাধক সূক্ষ্ম-জগতে প্রবিষ্ট হইবার অধিকারী হইলে আত্ম-প্রসন্নতা লাভে সৌভাগ্যবান হইবে, আত্মা সাধকের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলে অথবা সাধকের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা-দৃষ্টি হইলে সাধক অন্তরে মনিপুর চক্রের লীলা অনুভব করিতে থাকে এবং জ্যোতিঃ-দর্শন ও ঈশ্বর-রূপ দর্শন লাভে সমর্থ হয়। সাধকের মন এই প্রকারে সূক্ষ্ম ভাবের সহায়তায় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে নিমগ্ন হইলে সাধক অনুভব করিতে পারে বিশ্বের বিশাল অনুভূতিঃ সমস্ত বিশ্ব যাহার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইয়া থাকে সেই পরমাত্মার যোগ-সাধনায় অধিকারী হইয়া সাধক এই বিশ্বের কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে—দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ও দূরগমনের ভাবে বলীয়ান হইয়া নানাবিধ শক্তির অধিকারী হইতে পারে। সাধকের মনে অনুরাগের স্রোত প্রবল হইলে সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর-ভাবে নিমগ্ন হইয়া হৃদয়-গগনে অভীষ্ট দেবের বা আত্মার সঙ্গে রস-কেলি অনুভব করিতে পারে এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া ঐশ্বরীয় রূপ

রসের আস্বাদনে দিনাতিপাত করে। তখনও সাধকের বিদেহ-বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, নিজ-দেহ-জ্ঞান বিদূরিত হয় না। তখন সাধক আত্ম-কেলি-রসে পরিতৃপ্ত হইয়া অথবা ভগবানের সান্নিধ্য লাভে আনন্দ ও প্রেম-রস ভোগে বিভোরতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ আত্মার মিলন আকাঙ্খা করে। এই সময় সাধকের অসীম বিচার শক্তির প্রয়োজন হয়, মনে তীক্ষ্ণ বিচার-ধারা প্রবাহিত হইলে, সত্যের অনুরাগী সাধক পূর্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভে প্রয়াসী হয়; তখন সূক্ষ্মতম মানসিক গতির ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন-সুখ অনুভূত হইতে থাকে। বিশ্বজগৎ বিলীন হইয়া যায়—কেবল আত্ম-সত্তা বোধ করিয়া সাধক অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়। দেহের ভাব মন হইতে বিলীন হইয়া যায় এবং জগতের অস্তিত্ব পৃথক ভাবে প্রতীয়মান হয় না। যেই অধ্যাসের ফলে সৃষ্টি-প্রবাহ চলে সেই মনের অধ্যাস বিরতি লাভ করে—তখন সাধকের উপলব্ধ পূর্ণ সত্যের অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় আকার প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সাধক ব্রহ্ম হইয়া যায়—তাহার মনের বন্ধন থাকে না—কেবল প্রারব্ধ ভোগের জন্য মুক্ত-আত্মা দেহ-অবলম্বনে ইহ জগতে বিচরণ করে। এই প্রকার বিদেহ-মুক্তি লাভের পর মহাপুরুষ আত্ম-ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রারব্ধ-অক্ষয় পর্য্যন্ত জীব-জগতে সত্যের বীজ, সত্যের বাণী প্রচার করিয়া বিচরণ করিতে থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার তৎকালীন জ্যোতিঃ দর্শনাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ বিচার ও জ্ঞানের প্রভাবে মানসিক

গতির সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে নিমগ্ন হইয়া চলিতেছিলেন। তিনি এই সময় একাধিক্রমে বিতারা গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং আত্মীয় স্বজনের সহায়তায়, বাড়ীর ঠাকুর-ঘরের এক পার্শ্বে অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিজমনে উদাস-ভাবে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে তীক্ষ্ণ বিচার উদয় হওয়াতে তিনি অন্তর রাজ্যের সূক্ষ্ম-ভাব-নিচয় অনুভব করিতেছিলেন—নির্জ্জনে বাস তাঁহার চির-সাথী হইলেও এই সময় তাঁহার এই ভাব আরো বৃদ্ধি পাইল—তিনি দিবাভাগে ঠাকুর ঘরের প্রকোষ্ঠে দরজা বন্ধ করিয়া আত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন—রাত্রিবেলা গ্রামের কলরব নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলে তিনি নিকটবর্ত্তী ফুল-বাগানে আসিয়া বসিতেন এবং নৈশ নিস্তব্ধতায় তাঁহার স্বাভাবিক আত্ম-চিন্তা প্রগাঢ় হইয়া তাঁহাকে ধ্যানস্থ করিয়া রাখিত। কোন কোন সময় তিনি রাত্রির গভীরতাকে সাথী করিয়া শূন্য ভিটি-বাড়ীতে অথবা নিকটস্থ কোন শশ্মান-ভূমিতে বসিয়া আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন ; তখন কোন কোন হিংস্র জন্তুও স্বাভাবিক গতিতে তাঁহার আসপাশ দিয়া গমনাগমন করিত। এই ভাবে দিনগুলি যাপন করিবার সময় তাঁহার মনের স্তর সূক্ষ্ম জগতের এই ধাপে বিচরণ করিতেছিল যে তিনি দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ সম্পর্কীয় অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্ব-জগৎ যেন তাঁহার হৃদয়ে পরিস্ফুটাকারে বিরাজ করিতেছিল—সমস্ত বিশ্বের ভাসমান পরিকল্পনা হৃদয়-গগন

জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল ; তখন তাঁহার অনুভূতি জন্মিয়াছিল যেন সমস্ত বিশ্ব তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে—ইহাকেই বলে বিশ্বরূপ-দর্শন। তিনি গভীর বিচার-শক্তি পরায়ণ ছিলেন বলিয়া এই স্থূল জগতের অস্তিত্ব ও তাহার বিভূতি তাঁহাকে কোন সময়ই মুগ্ধ করিতে পারে নাই—এই সময় বিশ্বের উপর নিজ মনের অসীম ক্ষমতা লাভ করিয়াও তিনি জাগতিক ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চলিয়াছিলেন—কোন বাহ্যিক পদার্থের উপর মানসিক শক্তির আধিপত্য বিস্তার সুলভ হইলেও তিনি এই সকল ব্যাপারে বীতস্পৃহ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার মন ক্রমশঃ সাধনার সুক্ষ্মগতি অবলম্বনে উর্দ্ধে বিচরণ করিতে থাকিত। তিনি একদা উক্তি করিয়াছিলেন সাধকের মনে তীক্ষ্ণ বিচার না থাকিলে সাধক বিভূতি-রসে মত্ত হইয়া এই অবস্থায় বহুকাল অতিবাহিত করিয়া থাকে এবং কোন কোন সাধকের মন এই অবস্থায় উপনীত হইবার পর বিভূতি-রসে নিমজ্জিত হইয়া যোগ-ভ্রষ্ট অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার অসীম জ্ঞান-বিচার বলে মানসিক গতির এবম্বিধ অবস্থায় বাহ্যিক শক্তি-সিদ্ধির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোভাব ছিল অতি নিগূঢ়—তিনি চিরদিনই শান্তি ও সত্যের অন্বেষণে উদাসী হইয়া বিচরণ করিতেন—তিনি নিজ সাধনার অনুকূল অবস্থাই সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া চলিতেন—সুতরাং বিভূতি রাজ্যের মোহ তাঁহার চিত্তকে লুব্ধ করিতে পারে নাই। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের কনিষ্ঠ সহোদর যতীন্দ্র

তাঁহার সঙ্গে উক্ত ঠাকুর-ঘরের প্রকোষ্ঠে শয়ন করিত—কখন কখন রাত্রিবেলা তাঁহার সঙ্গে বাহিরে ফুল-বাগানে বসিয়া বাক্যালাপ করিত—নীরব নির্জ্জন-রাত্রে নৈশ পাখীর গভীর স্বরে তন্ময় হইয়া তাঁহার ভাব পরিদর্শন, করিবার সুযোগ পাইত; যতীন্দ্র বলিয়াছে যে তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মা বেশী সময় ঠাকুর ঘরেই বাস করিতেন—বেশী কথা বলা তাঁহার চিরদিনই অনভিপ্সীত ছিল এবং এই সময় তিনি মোটেই কথা বলিতে ইচ্ছুক হইতেন না —আহারে বিহারে অবহেলা করিয়া চলিতেন তাঁহার শরীর দিব্য ভাবে ভাবান্তরিত হইয়াও ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—কখন কখন তাঁহার মুখ ও নাক হইতে অজস্র লালা স্রাব হইত —তিনি মুখ ব্যাদন করিয়া থাকিতেন এবং স্বাভাবিক গতিতে মুখ হইতে লালা নির্গত হইত। ভাবাধিক্যের ফলে শরীরে যৌগিক-ক্রিয়ার ফলেই এই প্রকার লালা নির্গমন হইত। মানসিক চিন্তা ও ভাব-প্রবাহ তীক্ষ্ণ ভাবে চলিত বলিয়া তাঁহার দেহ শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল—রক্তাল্পতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহার দেহের সুস্থতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য যথোচিত চেষ্টা ও যত্ন করিত। কিন্তু শরীর ও মনের নৈকট্য সম্বন্ধ চির-বর্ত্তমান। মনে অসীম ভাব-প্রবাহ চলিতে থাকিলে সেই ভাবাধিক্যে মনের আধার যে শরীর, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মজ্ঞ-মা বলিয়াছেন—সাধারণতঃ মানুষ মনকে সংযমিত করার জন্য বহিরিন্দ্রিয় নিচয়ের কৃচ্ছ্রতা সাধন করে এবং এই প্রকার বাহিরের প্রণালী অবলম্বনে শরীর ও মনের বৃত্তিগুলিকে নিরোধ

করিবার জন্য যে সাধনার বহিরঙ্গীয় বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে স্বাভাবিক পন্থানুসরণে মনের বৃত্তির সংযম সাধিত হইলে শরীরের বৃত্তি ও সংযমিত হইয়া থাকে। মনে বিচার ও জ্ঞানানুরাগ বৃদ্ধি পাইলে, মন অন্তর্ম্মুখী অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, মনের স্বাভাবিক গতিতে মন স্থির হইতে স্থিরতর গতি প্রাপ্ত হয়। মন স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে শরীরে তাহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্থিরতর হইতে থাকে ; শ্বাসের স্থির গতির সঙ্গে দেহ হইতে বৈকারিক শ্লেষ্মা ও লালা নির্গত হইয়া পড়ে—দেহ ভাব-বলে শুদ্ধিতা লাভ করে, দিব্য ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী সাধক ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মনের এবম্প্রকারের গতির সহযোগে তাঁহার দেহের যৌগিক সাধন-প্রণালীর লক্ষণ সমূহ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তখন তাঁহার চিরন্তন ও অভ্যস্ত নিদ্রাল্পতা ও স্বল্পাহারে অভিরুচি আরো ক্ষীণতর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি স্বাভাবিক মনোগতির বশে সুখাসনে বসিয়া বহু সময় কর্ত্তন করিতেন—ইহাতে তাঁহার কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হইত না। বহিরিন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াস তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ছিল —বরং মন সংযমিত হওয়ায় তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় স্বতঃই স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥„

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনের গঠন ছিল স্বাভাবিক ভাবে বিষয় নিস্পৃহ এবং বিচারপ্রবণ। সুতরাং তাঁহার বাহ্যিক সাধনার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই এবং অন্তর্ম্মুখী মনের ভাবে তাঁহার সাধন-প্রণালী সহজ ভাবে চলিতে থাকায় তাঁহার শরীর চিন্তার প্রাখুর্য্যে কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীরের গ্রন্থিসমূহ শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাঁহার শরীরের কমনীয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বালকের শরীরের ন্যায় নম্র হইয়া পড়িয়াছিল। ভাবাধিক্যে ও সাধনার গতি অনুসারে শরীরের যথোচিত পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক গতিতে হইতেছিল। বাহ্যিক স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করার দরুণ তিনি কখন কখন রুগ্ন হইয়া পড়িতেন।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা মন-জগতের অবস্থাগুলি একটীর পর একটী অনুভব করিতে লাগিলেন। আত্মানুরাগে রঞ্জিত তদীয় মন অন্তর্জ্জগতের নানাবিধ রসানুভূতি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া স্থির হইতে স্থিরতর ভাবে ডুবিতেছিল। সাধক ও মুক্ত মহাপুরুষদের অভিজ্ঞ অন্তর্ম্মুখী মায়ার সহিত মনের রসাভিনয় ও সপ্তলোক-অভিহিত বিভূতি-বিলাস লোকোত্তর মহাত্মাদের উপলব্ধ সত্য—এই সকল ভাব হৃদয়ে উপলব্ধির জিনিস—যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইবার ও অনুভব করার জিনিস নহে। এই সকল সত্য উপলব্ধি যাহারা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদের অভিজ্ঞান-ধারাই "শ্রুতি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অপৌরুষেয় বাক্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ণ সত্য-উপলব্ধি বাক্য মনের অতীত—অনুভব-গোচর মাত্র। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ

মায়ের সাধন সম্বন্ধে যাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে আমরা তত্ত্ব-সম্বন্ধে ধারণা করিবার অতিরিক্ত কিছু বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারি নাই।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতো হন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

কঠোপনিষৎ।

আত্মা বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রাপ্তব্য বস্তু নহে অর্থাৎ বাক্য, মন ও অপরাপর ইন্দ্রিয় বৃত্তি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না; পরন্তু যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন তাহার নিকট ব্যতীত অন্য কি উপায়ে আত্মাকে পাওয়া যাইতে পারে? অর্থাৎ অন্য উপায় নাই।

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্ব ভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্ব-ভাবঃ প্রসীদতি॥

কঠোপনিষৎ

যাহারা আত্মার অস্তিত্ববাদী তাহারা তত্ত্বরূপে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং যাহারা আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদের তত্ত্ব-ভাব প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই আত্মা সম্বন্ধে সঠিক কথা অপরকে বলিতে সমর্থ। আত্মজ্ঞ মহাপুরুষদের অনুগ্রহ বলেই জগতে সত্য প্রচারিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ আত্মজ্ঞ পুরুষ নিজ চিত্তে সত্য-সাধনার উৎস যে ভাবে প্রকটিত হইতে দেখিতে পায় তাহার ধারা জগত সমক্ষে হস্তামলকবৎ সত্যরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ। সাধন

বলে স্বীয় অসীম মন-শক্তির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞ-মা এই সময় নিজ চিত্তে জগৎকে প্রতিফলিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। তদীয় মুখ নিঃসৃত বাক্যাবলীর সহযোগেই আমরা ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি যে তিনি তখন জানিতে পারিতেন বহু দূরের বার্ত্তা, দেখিতে পাইতেন বহু দূরের দৃশ্য। কিন্তু বিচার-প্রবণ ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মন সর্ব্বদা এই সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিত বলিয়া কঠোর যোগ-সাধ্য শক্তিনিচয়ে, অন্তর্জগতের উদ্ভাসিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লীলাভিনয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ধারা তাঁহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার অবসর পায় নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি বলে তিনি এই সকল বিরাম-প্রদ অবস্থাগুলিকে অতিক্রম করিয়া সত্য উপলব্ধির জন্য ছুটিয়াছিলেন; দৃশ্য ও দ্রষ্টার অভিনয় প্রকৃতির রসাভিনয়; ইহাতে শাশ্বত আনন্দ লাভ হয় না, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর মনগতির ভাবে ডুবিতেছিলেন।

“মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

কঠোপনিষৎ

যে ব্যক্তি অবিদ্যান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মেতে দ্বৈত-জ্ঞান কল্পনা করে, ভেদবুদ্ধির আশ্রয়ে চলে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সাধক দৃশ্য ও দ্রষ্টা বর্ত্তমান অবস্থায় সে অবস্থা অতিক্রম করিতে না পারে তাঁহার অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয় না— সে মৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে

না। সুতরাং সাধনার উচ্চ অঙ্গের বিভূতি হইতে ও মনকে অপসারিত করিতে হয়—বিন্দুমাত্র বাসনা বর্ত্তমান থাকিলেও অদ্বৈত আত্মানন্দ লাভ হয় না।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

কঠোপনিষৎ—

যখন মন হইতে সকল বাসনা বিলীন হইয়া যায় এবং বাসনা বিনির্ম্মুক্ত মনের স্থিরতম অবস্থা লাভ হয় তখন পূর্ণ সত্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ-মা অসীম আত্মার সসীম ভাবে বিরত থাকার ভাব চিত্ত হইতে সাধনার প্রারম্ভেই অপনোদন করিয়া ছিলেন তাহাতেই অসাধ্য-সাধন সিদ্ধ অন্তর্জগতের রহস্যাভিনয়ের অপূর্ব্ব রস ও তাঁহার চিত্তকে বিরাম প্রদান করে নাই। কিসে পূর্ণ সত্যকে জানিতে পারা যায় সে ভাবনা ও সে চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার মনের গতিকে চালনা করিত। তিনি প্রথমই অনুভব করিলেন তাঁহার আত্মসত্তাকে জ্যোতির্ম্ময় আকারে জগতের অতীত প্রদেশে—চিদাকাশে তিনি জ্ঞান-পথে বিচরণ করিতেন—এবং আত্ম-চিন্তা-ধারা নিয়া সাধন করিতেন—সেজন্য তিনি মন-গগনে জ্যোতিঃ দর্শন কালে ভক্ত-সাধকের পক্ষে ইষ্ট-ভগবানের দর্শনলাভের পরিবর্ত্তে নিজ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়াছিলেন; ভক্ত সাধক ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় দর্শন লাভের পর রূপরসাদির অনুভবে মন্দ-গতিতে সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে—কিন্তু জ্ঞানী

সাধকের পক্ষে সাধনার গতি তীক্ষ্ণতর বেগে চলে। সাধারণতঃ ভক্ত-সাধক ভগবানের রূপরসাদির যে লীলাভিনয় অনুভব করে, উপলব্ধি করে তাহা এত চিত্তাকর্ষক ও আরামপ্রদ হয় যে তীক্ষ্ণ-বিচার উপস্থিত না হইলে সাধনার গতি মন্দ হইয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্যাবলীর দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি জগতের মোহজাল, অন্তর্জ্জগতের রসানুভূতি এবং জ্ঞান বিচারের অসীম ক্ষমতা। প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত বিবেক ও বৈরাগ্য সম্পন্ন সাধক নিজ রুচি ও জ্ঞান-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সাধন জগতে অগ্রসর হইতে থাকিলে তাহাদের মন-গতির ক্রম অনুসারে তাহাদের উচ্চ জ্ঞান-স্পৃহা পরিতৃপ্তি লাভ করে। তখন কোন সাধকের পক্ষে বহু আয়াসে এবং কোন সাধকের স্বল্প আয়াসে ও পরিশ্রমে সিদ্ধি লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ মা অদ্বৈত সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু সে জন্য তিনি দ্বৈত সাধনার পক্ষে প্রতিকূল ভাব পোষণ করেন নাই। চিত্ত সরল ও নির্ম্মল হইলে, মন অনুরাগে রঞ্জিত হইলে তত্ত্ব-ভাব সকল সাধকের পক্ষেই সহজ হয়।

যে ভাবালোকে চিত্ত আলোকিত হইলে সাধক দেহ-বুদ্ধির অতীত হইতে পারে, বিদেহ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, যোগীরা তাহাকে বিশুদ্ধ-চক্রের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। সাধকের এই অবস্থা লাভ করিতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। কারণ কারণ-দেহ সূক্ষ্ম-দেহ ও স্থূল-দেহ ভেদে আত্মার যে ক্রমগতি তাহাতে পার্থিব স্থূল-ইন্দ্রিয়ের ভোগ ও মায়ামোহ অতিক্রম করিবার

জন্য যেরূপ সূক্ষ্ম অনুরাগের প্রেরণা আবশ্যক হয় তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহ ও তৎসম্পর্কীয় ভাবাবলীর রসাভিনয় অতিক্রম করিয়া কারণ-দেহে মনের অবস্থিতির জন্য সাধককে কঠোর সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ-দেহে অবস্থিতি লাভ করিতে পারিলে লোকের মৃত্যু-ভয় নিবারিত হয় সাধকের মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি ও অপার্থিব আত্মানুরাগের বলে বলীয়ান হইয়া দেহ-বুদ্ধির অতীত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার মন কারণ-দেহকে আশ্রয় করিয়া সমাধিরসে ভরপুর হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল ; এই অবস্থা কী আরাম-প্রদ, কী আনন্দ-উৎসের স্থান তাহা বর্ণনা করা যায় না, ভাষার অতীত, নিজ বোধগম্য, স্বীয় উপলব্ধির বস্তু মাত্র। সাধক এই সকল অবস্থায় বহু যুগ বহু জন্ম অতিবাহিত করিতে পারে ; কেবল তীক্ষ্ণ বিচারপরায়ণ অনুরাগী ভাবুক সাধক সত্যানুসন্ধানে ধাবিত মনের গতি লাভ করিয়া এই অবস্থাগুলিতে ও পরিতৃপ্তি বোধ করেন না। ব্রহ্মজ্ঞ-মা নিত্য আনন্দময় পরম ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য নিজ মনে ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে, সমাধি-রসের-ধারায় মন প্রাণ শীতল করিয়া পূর্ণ আত্ম-জ্ঞান. ধারায় নিমজ্জিত হইলেন। তিনি বাক্য-প্রয়োগে স্বকীয় তদানীন্তন অবস্থা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—মাটীর দ্বারা তৈয়ারী হাতী, হাতীনামের অধ্যাসে গণ্য হইলেও তাহা মাটী ভিন্ন অপর কিছু নহে—তদ্রূপ অসীম আকাশবৎ নিজের অসীম আনন্দ সত্তার

উপলব্ধি ও দ্বৈত অবস্থা—ইহাতে পূর্ণ সত্য জানা হয় না—নিজের অসীমত্বকে জানার অবস্থা হইতে নির্ব্বিকল্প অবস্থা লাভ দ্বারা সমাধি-রসে নিমগ্ন হইয়া তদীয় চিদাকাশ সত্য তত্ত্বে প্রতিভাত হইয়া অখণ্ড-দণ্ডায়মান-বোধ রূপে বিরাজ করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মা বহু সময় সমাধি-রসে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। কখন কখন তিনি সমাধি-ভাব হইতে ব্যুত্থিত হইয়া মহানির্ব্বাণ-রস ধারায় তন্ময় হইয়া পড়িতেন এবং স্বল্প দিনের মধ্যেই মহাপ্রয়াণে প্রস্থান করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা সাধনার চরম সীমানায় উপনীত হইয়া আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সহস্রার পদ্মের অমৃত নির্ঝরণীর উৎসে হৃদয়-কন্দর প্লাবিত করিয়া সমাধির অপূর্ব্ব বিমলানন্দ উপভোগে দিন কর্ত্তন করিতেছিলেন। একটী পূর্ণ কুম্ভকে অগাধ জলে ডুবাইয়া রাখিলে যে পূর্ণত্ব অনুভূত হয়—কোন অভাব অনুভব থাকে না—কেবল শান্তি বিরাজ করে, তাঁহার মন তদ্রূপ পরিপূর্ণ রস-ধারায় পূর্ণ কুম্ভের মত শান্ত অদ্বৈত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। তিনি স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

আমি পরম জ্যোতিঃ নিত্য শিব চিন্ময় ;
আমি অজর অমর নাহি মম কোন ভয়।
আমি অখণ্ড অব্যয়, নির্ব্বিকল্প-রূপ
নাহি মন, বুদ্ধি, দেহ—আনন্দ মম স্বরূপ।

নাহি তথা সুখ দুঃখ, নাহি কোলাহল ;
নীরব নিস্তব্ধ সদা, আনন্দ কেবল।
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি জনম মরণ ;
নাহি পাপ পুণ্য, ত্রিতাপ-বন্ধন।
নাহি লিঙ্গালিঙ্গ, নাহি ভেদ-জ্ঞান ;
এক মাত্র পরমাত্মা আছে বিদ্যমান।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা বিরচিত।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার সমাধি-রসের বর্ণনা বহু প্রকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেন "মৃত্যুর মত দুঃখ নাই, সমাধির মত সুখ নাই।" তিনি সমাধি-ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন সে অবস্থা যেন আকাশবৎ বিরাট হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে ; তাহাতে কোন অভাব নাই, জানিবার বাকী নাই, বুঝিবার বাকী কিছুই নাই কেবল পূর্ণ শান্তি।

তিনি সমাধি-রসে ডুবিয়া আত্মানন্দের রস-ধারায় দিনাতিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। মনে কোন বাসনার অঙ্কুর বিদ্যমান না থাকিলে মন মর-জগতে দেহাশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না। তিনি মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য ছট্‌ফট্ ভাবে দিন যাপন করিতেছিলেন—তখন তাঁহার মনে অকস্মাৎ ইহ জগতের বিশাল সমুদ্র ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতরাজি বিলোকনের আকাঙ্খা জাগরিত হইল। তিনি গ্রামের প্রিয় বালক বগলা সরকার ও যামিনী চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রাগুক্ত মন-ভাব জ্ঞাপন করিয়া বালকদের সঙ্গে

হাস্য পরিহাস বিনিময়ে বলিয়াছিলেন যে জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় বিশাল সমুদ্র ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা দর্শনে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিয়াছে-ইহাতে তাঁহার চিত্তের কথঞ্চিৎ চঞ্চলতা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার দেহ-ধারণ কিছু কাল সাপেক্ষ হইবে এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিরূপে এবং কোথায় গেলে সেগুলির দর্শন জুটিবে। গ্রাম্য সরল বালকেরা তাঁহার কথা গুলি অসম্ভাব্য ভাবিয়া নিরুত্তর ছিল এবং ধারণা করিতে পারে নাই যে মহাপুরুষদের বাসনাবিনির্ম্মুক্ত চিত্তে কোন ক্ষুদ্র বাসনার কারণ উপস্থিত হইলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকে না। মুক্তাত্মাদের প্রাণে কোন বাসনা উদয় হয় না তবে যদি কোন ক্ষুদ্র বাসনা তাহাদের নির্লিপ্ত প্রাণে উদিত হয় তবে তাহা সহজেই পুর্ণ হইয়া থাকে। সুদক্ষ নর্ত্তকীর পা যেমন বেতালে পতিত হয় না, তদ্রূপ বাসনা বিনির্ম্মুক্ত লোকোত্তর মানবের প্রাণে কোন বিষয়বাসনার উদ্রেক হয় না—তাহাদের প্রাণে জগতের কল্যাণকর এবং স্বকীয় চিত্ত-বিনোদনকারী বাসনার সমুদ্ভব হইয়া থাকে মাত্র। অঘটন-ঘট-পাটিয়সী মায়ার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলের মহিমা! কি অপূর্ব্ব রহস্য, কি মাধুর্য্য, কি চমৎকার অভিনয়-ধারা সৃষ্টি-প্রবাহে অহরহ চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে বিভোর হইতে হয়। কি ভাবে একের সাহায্যে অপরের অভাব পূর্ণ হইতেছে কি ভাবে জীব-জগতের পরস্পরের ঐক্য সাধনা সংঘটিত হইতেছে, কি ভাবে এক হৃদয়ের আকর্ষণে অপরের হৃদয়-পদ্ম বিকশিত হইতেছে, আবার কি ভাবে সৃষ্টি-প্রবাহের ধ্বংস-

লীলা সাধিত হইতেছে, এ সকল চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়ে ও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। মহাত্মাদের জীবন-প্রবাহ ও এই অপূর্ব্ব মায়ার রহস্যে জড়িত। সাধনাবস্থায় বিচার-পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের চিত্তে কোন শক্তির মাধুরী সমুদিত হইলে তিনি তৎসকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ও উদাসীন ছিলেন। তাই তিনি অন্তর্জগতের উপলব্ধ অলৌকিক অভিনয়ে চিত্ত-বিক্ষেপের কোন পরিচয় প্রদর্শন করেন নাই। স্বল্প বিচার সম্পন্ন সাধক শক্তির মোহে পথ-ভ্রষ্টও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া থাকে পূর্ণ সত্যকে পরিজ্ঞাত হওয়ার পর যখন ব্রহ্মজ্ঞ-মা ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার হৃদাকাশে বাসনার বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেনঃ তিনি ভাবিলেন এই হল অঘটন-ঘট-পটিয়সী মহামায়ার অপূর্ব্ব রহস্য —ইহাতেই তাঁহার মন নিবিষ্ট হওয়াতে আরো কিছুকাল তাঁহার দেহ-ধারণের কারণ সমুদিত হইল। তদীয় স্থির চিত্তে এক বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া তিনি দেশ দেশান্তরে যাইবার জন্য অধীর হইলেন, ধর্ম্মানুরাগী লোকসকলের সঙ্গে কথোপকথনের স্পৃহা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইল এবং এই ভাবে অধীর হইয়া প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে ও তিনি নানাস্থানে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি নারী-দেহ ধারণ করিয়াছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে চলাফিরা করার মত তাঁহার শারীরিক শক্তিও ছিল না, শরীর দুর্ব্বল ছিল তবু তিনি মানসিক গতির বশবর্ত্তী হইয়া স্থানান্তরে গমনের জন্য অধীর হইলেন এবং বিবিধ ভাবে তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠী বল্লী

সিদ্ধ-অবস্থা

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্তো হমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

কঠোপনিষৎ

এই জীবনেই মানব পূর্ণ ব্রহ্ম-রসানন্দের অধিকারী হইতে পারে এই শাস্ত্র-বাক্যের যথার্থতা আমরা ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অন্তরের বাসনাসমূহ পরিত্যক্ত হইলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে এবং এই জীবনে এই দেহেই ব্রহ্মকে জানিতে পারে ও ব্রহ্ম-রস অনুভব করিতে পারে। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের তদানীন্তন অবস্থার বিষয় জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া প্রশ্নোত্তরে যাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ উপলব্ধির কথা প্রসঙ্গে যে সকল ভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছে যে তিনি বুদ্ধ্যাদি কলারহিত নির্ব্বিকল্প ও নিরঞ্জন ব্রহ্মকে জানিয়াছেন: তাহার বুদ্ধি সত্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি" সেই ভাবের আনন্দ তাহার বাক্য-স্ফুরণে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দে-মেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥ সর্ব্বব্যাপিন

-মাত্মনং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্॥ অর্থবৎ যে বস্তু মন ও বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, পণ্ডিতগণ সেই আনন্দময় পদার্থকে জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। এই আত্মা সর্ব্বব্যাপী যেমন দুগ্ধের অভ্যন্তরে ঘৃত থাকে তেমন ইনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমন। ব্রহ্মজ্ঞ-মা জ্ঞাপন করিতেন জীব মাত্রই শিব, মানুষ বাসনা বিনির্ম্মুক্ত অবস্থা লাভ করিলে ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে এবং এই জীবনেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারে। তিনি নিজ তৃপ্ত আত্মার কথা প্রসঙ্গে বলিতেন তাহার কোন জানবার বাকী নাই, বোধ করার বাকী নাই; কেবল পরিপূর্ণ তৃপ্তি-ধারা ও শান্তি-প্রবাহ তাহার চিত্তকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈ র্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
অত্মে-ক্রীড়ঃ আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্ম বিদাং বরিষ্ঠঃ॥ মুণ্ডকোপানিষৎ

সর্ব্ব ভূতে বিরাজমান ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করার পর বিদ্বান ব্যক্তির অন্য কোন বাহ্যিক পদার্থের প্রয়োজন থাকে না—তিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট এবং আত্মাতেই রস অনুভব করিয়া থাকে।

তিনি বলিতেন একমাত্র আত্মাই জ্ঞাতব্য বিষয়, আত্মাকে জানিতে পারিলেই সকল জানা যায়। "যাস্মন্ জ্ঞাতে সববমিদং জ্ঞাতং ভবতি।" মানুষ মাত্রই তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা সেই শাশ্বত আনন্দকে লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে। প্রকৃতির মোহ-জালে আবদ্ধ জীব

যে সময় নিজ স্বাধীন আত্মার অনুসন্ধানে দীক্ষিত হয় তখন তাহার জীবন-গতি নদীর স্রোতের মত সকল মায়া-মোহ ভেদ করিয়া আত্মানুসন্ধানে আত্ম-তৎপর হইয়া চলিতে থাকে এবং অমৃত আত্মার রসে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য নানারূপ ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য ক্রমচেষ্টায় তৎপর হয়। তখন তাহার মন আত্মার অনুধাবনে তৎপর হইয়া ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য ক্রমশঃ স্থির হইতে স্থিরতর অবস্থা লাভ করে। পারিপার্শ্বিক জাগতিক বিষয় সকল তাহার নিকট ক্রীড়া পুতুলের মত অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে থাকে। আত্মার দিব্য-রসে অনুপ্রাণিত তাহার মন আত্ম-রসানুভূতিতে পরিতৃপ্ত হইতে অভ্যস্ত হয় এবং জীব-ভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাগরে মিশিয়া যায়। এই সকল তত্ত্ব-কথার সহযোগে ব্রহ্মজ্ঞ-মা প্রতিনিয়ত অনিত্য বস্তুর প্রতি উপেক্ষা ও আত্মনুরাগের হেতু প্রদর্শন করিতেন। তিনি তখন কেবল আত্ম-রসানুভূতি ও আত্ম-ক্রীড়া-রস ব্যতীত বাহ্যিক জগতে মনের রসানুভব করিতেন না। তদীয় সমাধি-মগ্ন গভীর মনে কোন বাহ্যিক বিষয়ের অনুধাবনা ছিল না। তখন তিনি ভাবিতেন ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবার পরিকল্পনা। জগতের ভাব তাঁহার হৃদয়-কন্দরে স্থান পাইত না। তাঁহার মনের অপার্থিব গতি-ধারা তাঁহার হৃদয়পট হইতে বাহ্যিক কল্পনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি সমাধি রসেই মজিয়া থাকিতেন।

"কিমপি কিমপি সতত বোধং কেবলানন্দরূপং নিরবধি গগনাভং নিষ্কলঙ্কং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ।"—সেই সমাধি রস অব্যক্ত আনন্দ-ধারা। বিবেকচূড়ামণি। সেই পূর্ণ শান্তি, অসীম আনন্দ ও ব্রহ্ম-রস তাঁহার মনকে অনুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিত। কিন্তু তাঁহার হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত ভাব-স্রোত কী এক অপূর্ব্ব সন্ধানে বহির্ম্মুখী ভাব প্রাপ্ত হইল। তিনি মনের গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটা মানসিক আন্দোলন অনুভব করিলেন। তদীয় শুদ্ধ বুদ্ধ চিৎ-সাগরে একটী অভিনব লহরীর সৃষ্টি হইল। সমাধি-ভাব হইতে ব্যুথিত চিত্তে তিনি কি যেন অনুসন্ধান করিতেন বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি জ্ঞাপন করিতেন পূর্ণ অদ্বৈত শান্তি—কিন্তু তাঁহার মনে উদ্বেলিত হইল একটী লহরী—তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মপিপাসু লোকের সহযোগ কামনা করিয়া প্রিয় সহচর যতীন্দ্র, যামিনী ও বগলাকে নিজ মনোভাব লুকাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মনে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ও বিশাল সমুদ্র দেখিবার সাধ কেন হয়? তাহা কি সম্ভবপর হইবে?" তাহার মনে তদীয় বাসনার পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা প্রদীপ্ত ছিল—সঙ্গীয় সহচর বালকদের সে বিষয় সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিত—তাহার অসীম জ্ঞান ধারার প্রতি বিশ্বাস করিত—তবু তাহার মত একজন গ্রাম্য মহিলার পক্ষে এতাদৃশ কল্পনা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। তাহারা সে সকল কার্য্য অসম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল।

পরসময়ে ব্রহ্মজ্ঞ-মা তদীয় প্রিয় ভক্তগণসহ পুরী-ধামে বাস করিবার সময় সমুদ্র-দর্শনে প্রীত হইয়া এবং দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত কার্শিয়াং মহাকুমায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বসতি-কালে অত্যুচ্চ কাঞ্চন-জঙ্ঘা পর্ব্বত শৃঙ্গ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বতন মনের কথা ব্যক্ত করিয়া, যামিনী ও বগলা প্রভৃতির ধারণা প্রকাশ করিয়া হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন। বিধির বিধান চির-রহস্যে বিজড়িত। ব্রহ্মজ্ঞ-মা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন "ব্রহ্মদর্শনের পর তাহার নির্লিপ্ত মন ক্রমশঃ ব্রহ্ম-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে এই তাহার ধারণা ছিল ও অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু কি জানি কী অভাবনীয় ভাবের বাত্যায় তাহার হৃদয়-কুসুম আলোড়িত হইল এবং সেই কুসুম-গন্ধ বিতরণ করিবার জন্য তাহার অপূর্ব্ব অনুপ্রেরণা জন্মিল—তখন তিনি চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটির ভাবে ব্যস্ত-হইলেন। মন ধরিয়া রাখিতে অক্ষম এরূপ গভীর ও অসীম ভাব-প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া তিনি তাহার তদানীন্তন মনের বিরুদ্ধ-চিন্তা স্রোতে ভাবিতেন—"মন লয় হইলেই তাহার পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি হইবে—ব্রহ্ম-রসে নিমগ্ন তদীয় মন প্রদীপনির্ব্বাণ-ভাবে বিভোর হইলেই তাহার মুক্তি সাধন হইবে—ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে; তাহার কিছু জানিবার বাকী নাই, তাহার কিছু অনুভব করার বাকী নাই—অথচ অঘটন-ঘট-পটিয়সী মায়ার প্রভাবে তিনি ভাবিলেন যে তাহার অফুরন্ত ভাবরাশির আদান-প্রদানে অত্যধিক আনন্দ-অনুভূতি হইবে; তাহার ব্রহ্ম-রসানুভূতির ভাব-প্রবাহ চারিদিকে প্রবাহিত হইলে একটা অভিনব আনন্দ-

-ধারার উৎপত্তি হইবে—যাহাতে তাহার ভাবের কোন প্রত্যবায় উপস্থিত হইবে না, যাহাতে তাহার কোন প্রকার শান্তির-ব্যাঘাত জন্মিবে না। এই হৃদয়ের আরামের ভাবে ঢলিয়া—পড়িয়া তিনি ভাব-প্রবাহ ছড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ভাবিলেন—তাহার নিকট পূর্ণ সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার কোন ভয় নাই, চিন্তা নাই ; তাহার মৃত্যু নাই। তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞান জীব ও জগতে ছড়াইয়া দিবার অদম্য স্পৃহা তাহার মন জুড়িয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্ম-রসানুভূতির আনন্দ-কণা বিতরণের অনু-প্রেরণায় তদীয় হৃদয়-কন্দর ভাব-স্রোতে উদ্বেলিত হইল এবং তিনি মানস-চক্ষে চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় ভাবের অনুকূল পন্থার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি নাতি দূরে বায়েক গ্রামের দিকে মানস-চক্ষের দৃষ্টিতে আলোক-পাত পরিকল্পনা করিয়া তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন ও সাচার গ্রামে যাইয়া তদীয় ভাব-বার লাঘবের পন্থা খুঁজিয়া লইবেন বলিয়া অন্তরে অন্তরে ব্যস্ততা অনুভব করিলেন। তিনি প্রিয় বালক ভ্রাতার-সহগামী হইয়া ১৩১৯ সনের মাঘ মাসে বহুদিনের নির্জ্জন-বাসের পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া সাচার জমিদার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ঃ তখন তাহার দিব্য ভাব বিলোকনে তথাকার সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল—কিন্তু ভাব আদান প্রদানের কোন প্রকার বিহিত ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট না হওয়াতে তিনি সে সময় সেখানে দুই চারিদিন অতিবাহিত করিয়া নিজ গ্রামে

ফিরিয়া আসেন। তখন ফাল্গুন মাসের শিব-চতুর্দ্দশী তিথি উপলক্ষে সীতাকুণ্ড-ধামে মেলার উৎসবের তারিখ সম্মুখবর্ত্তী হইল। গ্রামস্থ বগলা মোহন সরকার ও জগৎচন্দ্র দে তথায় মেলাদর্শনে তীর্থ-ভ্রমণ করিবে শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহাদের সহযোগে তথায় যাইবার জন্য অভিলাষী হইলেন। তাঁহার নানা স্থানে যাইবার স্পৃহা, ধর্ম্ম-পিপাসুলোকের সঙ্গে কথোপকথন করার ইচ্ছা এত প্রবল হইল যে তিনি প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও ছুটাছুটির ভাব পোষণ করিতেছিলেন এবং বিশেষ অনুকূল অবস্থার ব্যবস্থা খুঁজিয়া না পাইয়া বৃথা কারণে সীতাকুণ্ড পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া উক্ত প্রতিবেশী লোকদের সহযোগে সীতাকুণ্ড যাইতে ব্রতী হইলেন, তখন তাঁহার শরীর ভাব-প্রবণতায় কমণীয় আকারে পরিণত হইয়াছিল। শারীরিক কষ্ট-সাধ্য কার্য্যে তাঁহার শরীর নিয়োগ করার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি তখন হাটিবার সময় এদিক ওদিক ঝুকিয়া পড়িতেন ও আহারে বিহারে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কিছু করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতেন না। সীতাকুণ্ড-ধামে এই গ্রাম হইতে যাওয়ার পথের ব্যবস্থা ও সুগম ছিল না যাত্রীদের ১২ মাইল পদব্রজে চলিয়া হাজিগঞ্জ ষ্টেশন হইতে তথায় যাইতে হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মত একজন গ্রাম্য ভদ্র মেয়ে-লোকের পক্ষে যাত্রীদের সহযোগে যাওয়া দুস্কর ও কষ্টসাধ্য ছিল! তবু ব্রহ্মজ্ঞ-মা নিজমনের বিক্ষিপ্ততায় পরিচালিত হইয়া আত্মীয় স্বজনের কথা উপেক্ষা করিয়া পদ-ব্রজে

অতি কষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সীতাকুণ্ড মেলাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহাই মনে হয় যে তিনি তখন অত্যন্ত মনের ছুটাছুটি ভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং তদীয় একাগ্র মনে সমুদিত ইচ্ছার বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি তীর্থব্রতের পুণ্যকার্য্যের কথা দূরে থাকুক অন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট মনোবৃত্তি নিয়াও ঐ কার্য্যে যোগ দেন নাই; মনের তদানীন্তন বিক্ষিপ্ততাই কারণ ছিল। তিনি এই ভ্রমণ ব্যাপারে জীবনে অপরিজ্ঞাত দীর্ঘপথ হাটিয়া যাওয়ার দরুণ ও সীতাকুণ্ড-ধামে অনিয়মিত চলাফেরা করার জন্য এবং অনিদ্রা ও অনাহারে থাকায় অত্যধিক শারীরিক কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সেখানে সপ্তাহকাল ব্যাপী অনাহারে দিন কর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং পথে লোক-গঞ্জনা ও বিরামহীন পথের ক্লান্তি ভোগ করিয়া, কেবল মানসিক উদ্বেগের বশে এতাদৃশ কষ্টকে সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ মানসিক গতির অনুকূল কোন দৃশ্য বা সাধু-সমাগম পরিদৃষ্ট হয় নাই। কেবল মাত্র তাঁহার তৎকালীন মানসিক গতির বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া তিনি বার কি চৌদ্দদিন পরে সঙ্গীয় লোকসহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দেশে আসার পর ও তাঁহার মানসিক চঞ্চলতা পরিত্যক্ত হয় নাই। অধীর মনে দিন কতক কাটাইয়া তিনি পুনরায় সাচার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার দিব্য দেহ-প্রভা, অসাধারণ তত্ত্ব-প্রশ্নের অবতারণা ও সমাধি-মাধুর্য্য দেখিয়া

স্থানীয় বিশিষ্ট লোকজন মোহিত ও বিস্মিত হইয়া পড়িল। সারদা প্রসাদ সেন ও অন্নদা চরণ ভৌমিক্ প্রমুখ গ্রাম্য বিশিষ্ট লোকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ-মা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম-কথা, তত্ত্ব-কথার সূত্র-পাত করিতেন। তিনি তখন তাঁহার অভিনব সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া নিজ মনোভাব গুপ্ত রাখিয়া ধর্ম্ম-কথার ও উপদেশের অভিলাষী হইয়া যেন তত্ত্বপ্রশ্ন উপস্থাপিত করিতেন। "অভিমানং সুরাপানং প্রতিষ্ঠা শূকর-বিষ্ঠা।" অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোক অভিমানকে সুরাপানের মত বিকার-উৎপাদক এবং বিষয়-বৈভবকে ঘৃন্য শূকরের বিষ্ঠার মত অবলোকন করে। এই তত্ত্ব-কথাটার ভাব ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের স্বভাবে পরিদৃষ্ট হইল। অসীম তত্ত্ব-ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াও তিনি উপদেশ প্রার্থী হইতেন—নিজ অসীম ক্ষমতা গোপন রাখিয়া দৈন্য ভাবে লোকের সঙ্গে ধর্ম্ম-কথার বিনিময় খুঁজিতেন। কোন ধর্ম্ম-কথার আলোচনা আরম্ভ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "ধর্ম্ম-কিসে পাওয়া যায়, শান্তি কিভাবে মিলিতে পারে, আত্মা কি?" জন্ম-মৃত্যুর প্রহেলিকা বিশেষ করিয়া তাঁহার জিজ্ঞাস্য ছিল। তিনি তখন অন্নদাবাবু প্রমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গে অদ্বৈত-তত্ত্ব, জ্ঞান-বিচার ও ঐশ্বরীয় কথা এইভাবে আলোচনা করিলেন যে তাহারা তাঁহার ভাবপ্রবাহে মোহিত হইয়া ততোধিক তাঁহার জ্ঞান-বিচারের ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইল এবং লোক-সমাজে তাঁহার পরিচয় ও খ্যাতি বিস্তার করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-কথা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ লোক সমাজ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির

কথা, পূজা-অর্চ্চনার কথা ও ভগবানের প্রাপ্তির উপায় বিধা
ব্যতীত উচ্চাঙ্গের জ্ঞান বিচার ও অদ্বৈত তত্ত্বের ভাব আলোচ
করে না। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মত এক জন গ্রাম্য ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু নারী
নিকট এত উচ্চ ধর্ম্ম-ভাবের আলোচনা শুনিয়া সকলেই মোহি
হইল। তদবধি তিনি লোকসমাজে পরিচিত হইলেন এ
লোকসমূহ তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহি
ধর্ম্মালোচনায় সমবেত হইতে লাগিল।

সপ্তমী বল্লী

ভক্ত সমাগম এবং ভক্ত-সহ অতিবাহিত জীবন।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

"যাহারা দিব্য ধাম বাসী অমৃতের পুত্র ছিলে সেই বিশ্ববাসী মানব শ্রবণ কর—আমি মহান্ পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি—তাঁহার রূপ আদিত্যের ন্যায় ও তিনি সকল অন্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিতে পারিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—উহার আর ভিন্ন পথ নাই যাহাতে মৃত্যুপাশ দূরীভূত করা যাইতে পারে।" বেদান্ত দুন্দুভি নিনাদে ঘোষণা করিলেন অমৃতের বাণী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মাত্রই সেই অমৃতের আস্বাদন পাইয়া জীব-জগতে অভয় বাণী প্রচারে উৎসাহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ-মা অমৃতের তত্ত্ব জীব জগতে বিলাইয়া দিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। প্রাকৃতিক জগতে এবং দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রত্যক্ষ হয় সেই চিরন্তন প্রণালী। শারদকালে উদীয়মান পূর্ণ শশীর কিরণ প্রভা সুবিমল জ্যোৎস্নার জালে জগতকে

সমুচ্ছল করিয়া থাকে; রবি-রশ্মি আকৃষ্ট মেঘ-পুঞ্জ শ্রাবণের ধারা রূপে ধরণীকে প্লাবিত করিয়া দেয়; চন্দ্রাকর্ষণে উদ্বেলিত সমুদ্রের বারি রাশি দেশ বিদেশে ভাসাইয়া স্রোতাকারে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ মুক্ত মানবের স্বীয় উপলব্ধ ব্রহ্ম-রস-বারি প্রবাহ জগতের মোহগ্রস্থ মানব মণ্ডলীর প্রাণে তত্ত্ব-ভাব বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-গুরু অবতার মহাপুরুষদের প্রবর্ত্তিত দীক্ষা ও শিক্ষা কি ভাবে জগতের লোক সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়া জীব জগতের অসাধারণ কল্যাণের হেতু হইয়া রহিয়াছে তৎসকল বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভুক্ত ধর্ম্মগ্রন্থে ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও পরমহংস রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্ম-তত্ত্বের কথাই বল অথবা আদি যুগের রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষদের দ্বারা উপাদিষ্ট শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-বিষয়ই বল, সকল মুক্ত মহাপুরুষদের জীবনেই জগতের হিত-সাধনে ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচারের উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। অঘটন-ঘট-পটিয়সী মায়ার মোহ-জাল বিস্তারের যেপ্রকার নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, জীবজগতের উদ্ধারের জন্য তদ্রূপ কৌশল যুগে যুগে অবতীর্ন মুক্ত মানবের প্রাণ-স্পৃহা দ্বারা সমাহিত হইতেছে। মরীচিকা-ভ্রমে তৃষ্ণাতুর মৃগের পরিভ্রমণের ন্যায় মায়া-মুগ্ধ জীব মায়া প্রপঞ্চের প্রহেলিকায় ঘুড়িয়া বেড়াইতে থাকে; তখন মুক্ত মহাপুরুষদের প্রচারিত ধর্ম্ম-কথা ও উপদেশই মায়া ছেদনের অস্ত্ররূপে দণ্ডায়মান হইয়া ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মানবের

মুক্তি-সাধন করিয়া দেয়। এই অপূর্ব্ব ভাব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত। একদিকে প্রকৃতির মহীয়সী মোহ-জাল বিস্তারের শক্তি এবং পক্ষান্তরে তত্ত্ব-প্রবাহের অমোঘ জ্ঞান উদ্ভাবনের অপূর্ব্ব ক্রিয়া-কৌশল সৃষ্টি চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়া চলিতেছে।

অনাদি কাল হইতে সত্য—এক, নিত্য ও অব্যয়। ধর্ম্ম-তত্ত্ব সেই অনাদি সনাতন সত্যেরই প্রচারক। ধর্ম্ম দেশ ও কাল ভেদে যেরূপ বিভিন্ন আকারে লোক সম্মুখে সমুপস্থিত হইতেছে, তদ্রূপ যুগে যুগে অবতীর্ণ মুক্ত মহাত্মাদের উপলব্ধ বাণী ও তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম-কথা ও সঞ্জীবিত ও প্রচারিত হইয়া মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছে। সুতরাং কোন দেশে কোন সময় কোন মুক্ত পুরুষের আবির্ভাব হইলে তদীয় ধর্ম্ম-উপদেশ শ্রবণ ও সাধনা দ্বারা মানব মণ্ডলী ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইবার প্রভূত সহায়তা পাইয়া থাকে—তখন প্রাচীন ধর্ম্ম-উপদেশ অপেক্ষা তদীয় বাণী প্রবলতর রূপে লোকের চিত্ত আয়ত্ত করিয়া থাকে। প্রকৃতির অভাব কি অচিন্তনীয় শক্তি প্রভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করে যে ভাবিলে চিত্ত বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া থাকে। সৃষ্টি-কৌশল যেমন লোক বুদ্ধির অগোচর, সৃষ্টি-ক্রিয়ার সমাধান ও তদ্রূপ বুদ্ধির অগম্য। গীতায় উক্ত আছে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

গীতোক্ত এই বাক্যের গূঢ় অর্থ এই যে প্রকৃতির অভাব

মোচনই পুরুষের কার্য্য। যখন প্রকৃতি কোন কারণে পীড়িত, নিষ্পেষিত হয় তখনই তাহার মোচনের উপায় মহাকাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। চণ্ডী-প্রোক্ত দেবাসুর যুদ্ধ তাহাই প্রতিপাদিত করে ; অসুরগণ কর্ত্তৃক বিতারিত দেবকুলের পরিরক্ষণের জন্য চণ্ডী-দেবীর আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই আদ্যাশক্তি চণ্ডী-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম যখনই গ্লানি-বিজড়িত হইয়াছে তখনই তাহার সমুদ্ধর্তা উপস্থিত হইয়াছেন। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অপব্যবহারে যখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কালিমাগ্রস্থ হইল তখন সুমহান্ বুদ্ধ-অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। বৈদেশিক জাতির সংস্পর্শে মানুষ ধর্ম্মাচার হইতে পতিত হওয়ায় ধর্ম্ম-বিমুখ লোকের প্রাণে ঐশ্বরিক প্রেম ও ভক্তি জাগরিত করার জন্য দয়ার অবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সংঘটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক প্রভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের বৈশিষ্টের অবলোপ হওয়ার প্রাক্কালে যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব উপস্থিত হইয়াছেন। তদীয় শিষ্য বিবেকানন্দ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অমোঘ বাণী প্রচারের জন্য চিকাগো-ধর্ম্মসভায় সত্য প্রচারে প্রয়াসী হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যখনই বিশ্বের নিয়মতন্ত্রে অভিযান দেখা দিয়াছে তখনই মহাকাল তাহার সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। কালের অভাব মোচনের জন্য কালে কালে কত মুক্ত মহামানব এই ধরণীবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কালোচিত বাণী দ্বারা জগতের ধর্ম্ম ও শান্তি-লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন

তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাপুরুষেরা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কালোচিত ভাবের অভিনয়ে মানব মণ্ডলীর মহাকল্যাণ সাধন করেন। শিশু-পরিরক্ষণে স্নেহময়ী মাতার যেরূপ আগ্রহ ও যত্ন স্বগঠিত মায়া দ্বারা পরিচালিত হয় তদ্রূপ মুক্ত মহামানব স্বীয় ভাব-প্রবাহে জগতের হিত-সাধন করিয়া থাকেন ইহাতে তাহাদের কতই কষ্ট ও দুঃখকে বরণ করিতে হয়। ফল-ভারে অবনত বৃক্ষ পথিকের হাতে ফল উঠাইয়া দেয় খর-স্রোতে বহমান নদী জন মণ্ডলীর-তৃষ্ণা মিটাইয়া প্রবাহিত হয়; তদ্রূপ ঐশ্বরিক ভাবে ভরপুরচিত্ত মুক্ত মহামানব অহৈতুক কৃপা বিতরণে তত্ত্ব-ভাব প্রচার ও উপদেশ দিয়া জগতের মুক্তির পথ সুগম করিয়া দেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধ অবস্থা লাভের পর ব্যাকুলপ্রাণে ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি মাধুর্য্যময় লীলা! বাস্তবিক এই জগৎ ঈশ্বরের লীলা-নিকেতন এবং জীবসমূহ তাহার ক্রীড়া পুতুল। শ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের দর্শন লাভের পর আমরা তাঁহার মধ্যে এইরূপ অপরূপ ভাব-মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি ব্রহ্ম-রসানুভূতি দ্বারা ভরপুরচিত্ত হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দ জীব জগতে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন, ব্রহ্ম-রস উপলব্ধি করিলেন—অসীম ভাব-ধারায় নিমজ্জিত তদীয় চিত্ত অপার সমুদ্রবৎ ধীর ও স্থির হইয়া অবস্থান করিল। সেই অপার্থিব আনন্দ-স্রোতে ভাসমান তাহার মন সর্ব্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে অসীম গগনে লুক্কায়িত

৭

সুমহান্ তারকার ন্যায় স্বীয় জ্যোতি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু জগতের হিত সাধণের আকাঙ্খা তাহার চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল—তিনি দেখিলেন নিজ চিত্ত-পটে বিশ্বের চিত্র এবং সেই বিশ্ব-প্রেমে ক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া তিনি পূর্ব্ববৎ ধীর মনে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। কতই না দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইবার জন্য উন্মাদের মত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণে প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা যখন দ্বাত্রিংশৎ-বর্ষ-বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তিনি সাধনার সর্ব্বোচ্চ মহিমায় বিরাজ করিতেছিলেন—তিনি অনুক্ষণ সমাধি-রসে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি বহির্বাটীর ঠাকুর ঘরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্টে নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মানন্দে মজিয়া থাকিতেন। দিনের পর দিন এই ভাবে অন্তরাত্মার প্রেম-রস সিঞ্চনে মুগ্ধ থাকিয়াও তদীয় চিত্ত এক ভাবে বেশী দিন অবস্থান করিতে পারিল না। অগাধ সমুদ্রের বারি-রাশি যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রের আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে তেমনি পূর্ণ সত্যালোকে অধিষ্ঠিত, অনন্ত ব্রহ্ম-রসে পরিতৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন স্বীয় সত্যানুভূতি জীব জগতে প্রচার করিবার জন্য অধীর হইল। কি জানি কোন অলক্ষিত প্রেমাকর্ষণে অস্থির চিত্তে তিনি দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তিনি শারীরিক বলে বলীয়ান ছিলেননা তাহার লঘু ক্ষীণ দেহ তখন ভাব-বন্যার প্রেরণায় অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছিল—পুরুষ মানুষের মত নারী-

দেহের স্বভাবতঃই শারীরিক শক্তি ও বল কম থাকে এবং নারীরা কিছুতেই বাহ্যিক গতিবিধির কাজে তদ্রূপ শক্তি সামর্থ পায় না। ব্রহ্মজ্ঞ-মা এ সকল অসুবিধার কথায় কাহারও পরামর্শেই কর্ণপাত করিলেন না। তৎসময় তিনি কেবল বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। তখন (বাংলা ১৩১৯ সনের ফাল্গুন মাসে) গ্রামস্থ জগচ্চন্দ্র দে ও বগলা মোহন সরকার সীতাকুণ্ড ধামে শিবরাত্রি উপলক্ষে যাইবে শুনিয়া তাহাদের সহগামী হইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সঙ্গীয় লোকরা যেভাবে পদব্রজে দূরপথ চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের চিরাচরিত স্বভাব ও শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিহীন ছিল তবু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ সাহসের বলে দূরপথ পদব্রজে চলিয়া যাইবার জন্য ব্রতী হইলেন। সঙ্গীরা ও গ্রামস্থ লোক তাঁহার অসীম জ্ঞান ও উচ্চ ভাবের সম্যক্ পরিচয় জানিতে না পারিলেও তাহাকে দৈব-সিদ্ধ ভাবিয়া পরম শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করিত ঃ তাহারা উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া সীতাকুণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল এবং তিনি প্রথমতঃ বার মাইল রাস্তা হাটিয়া অতিক্রম করিলেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহার নিজ ইচ্ছা-শক্তির প্রেরণায় অনভ্যস্ত পথ-হাটার কাজে ও জনাকীর্ণ রেল-গাড়ীর গঞ্জনার মধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার চিরপরিচিত উপবাস-রীতিকে ধরিয়া সেখানে পাঁচ সাত দিন অনাহারে অনিদ্রায়

তীব্র কষ্ট যাতনা পাইয়া চোদ্দ দিন পরে বাড়ী পৌছিয়া অনশন ভঙ্গ করেন। সেখানে যাওয়ার জন্য তাহার পরমার্থ কোন স্বার্থ ছিলনা। তখন তাহার মনের অসীম ভাব-প্রবাহই তাঁহাকে ছুটাছুটির দিকে লইয়া যাইতেছিল। সেখানের প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য, মেলার দৃশ্য, সমবেত সাধুদের গতিবিধি দর্শন ইত্যাদি কিছুই তাঁহার মনের উদ্দ্যেশ্য ছিল না। তাঁহার মানসিক গতি কিছুতেই শান্তি পায়না, কিসে শান্তি পাওয়া যাইবে এই জন্যই তিনি স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক ইত্যাদি ভাব ও অভিপ্রায় তিনি বাহ্যতঃ প্রকাশ করিতেন। সীতাকুণ্ডধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার শরীর পথ-ভ্রমণে অবসন্ন হইয়া পড়িল—কারণ তিনি কখনও এত-দূর পথ হাটিয়া অতিক্রম করেন নাই—সমুচিত ব্যবস্থার অভাবে পক্ষান্তকাল পর্য্যন্ত আহারাদি করেন নাই—লোকগঞ্জনা তাঁহার শরীরের পক্ষে তীব্র কষ্ট-দায়ক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শরীর অবসন্ন হইলেও মন অতৃপ্ত রহিয়া গেল। তিনি দিনরাত অনুসন্ধান করিতেছিলেন কোথায় গেলে তিনি ভাবের বিনিময় পাইবেন, কোথায় অনুরাগী জন-সমাজ পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু বিশেষ কোন সুযোগ না পাইয়া একদা তিনি অধীর মনে নিকটস্থ সাচার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামে তাহার আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে তিনি পূর্ব্বে কখন কখন গিয়াছিলেন—কিন্তু এই সময় যেরূপ ভারাক্রান্ত মন হইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাঁহার এরূপ উদাসীন উচ্চভাব অপর

লোকেরা পূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই। এতাবৎ কাল তিনি সংগোপনে নিজ অমূল্য ভাব-রাশি লুকাইয়া রাখিয়া লোকের নিকট চলিতে-ছিলেন। এখন তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন তাহাকে অনুরাগী জন-সমাগম খুঁজিয়া লইতে বাধ্য করিল। তিনি অযথা ধর্ম্মালোচনা করিয়া কখনও সময় কর্ত্তন করেন নাইঃ নিজ ভাব সম্পদ্ অতীব গোপনে যক্ষের ধনের মত লুকাইয়া রাখিতেন। তিনি চিরদিনই কিসে চির শান্তি মিলে তাহার অন্বেষণে চলিয়া নিজ উদাসীন মনে, অপূর্ব্ব বিচার শক্তিবলে সাধন জগতে বিচরণ করিয়াছেন। ভ্রমেও তিনি কখনও সাধনলব্ধ ঐশ্বর্য্যের মহিমা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। তাহার বিচার শক্তি, তাহার মনের জ্ঞান-বিকাশ কি অপূর্ব্ব ভাবে সমাহিত হইয়াছিল তাহা কল্পনা করাও দুরূহ। অনন্ত সাধন-শক্তি হৃদয়ে ধরিয়াও তিনি ভিখারীর মত চলিতেন। তাহার মনে ভাব-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত না হইলে কেহ তাহাকে চিনিতে পারিত না এবং কাহার নিকটই তাহার স্বরূপ ধরা পড়িত না।

তৎসময় তিনি সাচার গ্রামে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন বটে—কিন্তু তাহার মনের উদ্দাম ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আত্মীয়গণের অনুরোধে তিনি বিতারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেখানে কয়েক দিন থাকার পর পুনরায় বৈশাখ মাসে (১৩২০ বাং সন) সাচার গ্রামে জমিদার বড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েক দিন কর্ত্তন করেন। তখন তাহার উদাসীন গতি, ধর্ম্মালোচনার তন্ময়তা

দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাহার পূর্ব্ববৎ লোক চক্ষুর অন্তরালে নিজ ভাব লুকাইয়া চলার অভ্যাস অন্তরিত হইল। তিনি সাধু ও ভাবুক জনের সঙ্গে ধর্ম্ম-কথা, তত্ত্ব-কথা বলিবার প্রয়াসী হইয়া স্বতঃ প্রাণোদিত ভাবে লোক বাছিয়া লইয়া কথার অবতারণা করিতেন। তিনি তখন অযাচিত ভাবে তথাকার জমিদার (যাহার বাটীতে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন) সারদা প্রসাদ সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে ধর্ম্ম কথার অবতারণা করিতেন এবং সময় অসময় ভুলিয়া আলোচনায় তন্ময় হইয়া পড়িতেন এবং বিশেষতঃ রাত্রিবেলায় নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অধীর ভাবে ধর্ম্ম-কথা বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-কথার বিন্যাসে মোহিত হইয়া শ্রোতাগণও নিদ্রা ভুলিতেন, এবং কাজের সময় ও আহারাদির কথা ভুলিয়া যাইতেন। বাস্তবিক ভাবের মাধুর্য্য ও সাধু ব্যক্তির প্রেমাকর্ষণ চিত্তকে অলক্ষিতে কিরূপ রসাল ভাবে বিভোর করিতে পারে, অজ্ঞান সুপ্ত চিত্তকে কিরূপ মুগ্ধ করিতে পারে যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের তদানীন্তন ভাব প্রবাহে শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাইয়াছেন তাহারা তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া ধীরেন্দ্র নাথ সেন, হরিপ্রসাদ সেন প্রভৃতি যুবকেরা তদীয় উপদেশ ও ধর্ম্ম-কথা শ্রবণে সবিশেষ মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা তাহার সঙ্গ-সুধা পাইবার জন্য অনুক্ষণ তাহার সঙ্গে চলাফিরা করিতে লাগিল গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন স্থানে, দেব-

মন্দিরে যেখানে ধর্ম্ম-কথা আলোচনার রসোদ্ভব স্বভাবতঃ জন্মে, তৎ তৎ স্থানে তাঁহার অনুগামী হইয়া চলাফিরা করিতে সুখবোধ করিল এবং অনেক দিন এই সুযোগের সুব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইল। তাহার নিকট তত্ত্ব কথার অভাবনীয় বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হইয়া এবং ততোধিক ধর্ম্মের সুবিমল রসানুভূতির অচিন্তনীয় সুযোগের অধিকার লাভে নিজদিগকে সমর্থ ভাবিয়া তাহারা বিস্মিত ও পুলকিত হইল এবং তদবধি সেই যুবকবৃন্দ ব্রহ্মজ্ঞ মাকে অনুসরণ করিয়া জীবন গতি কৃতার্থ করিল। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের তদানীন্তন মন-গতি বলে তিনি সরল ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন লোক পাইলেই ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত হইতেন। কিছু দিন পরেই অন্নদাচরণ ভৌমিক ঘটনাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করার সুযোগ পাইল। অন্নদাবাবু শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিল। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের কথা শ্রবণে তাহার বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং একদিন তিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপে ইচ্ছুক বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহার সহিত ধর্ম্ম-কথায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞ-মা চিরদিনই নিজেকে ধরা না দিয়া লোক সমাজে গতিবিধি করিতেন; কাজেই তাহার কথার সূত্রপাত ছিল অন্যরূপ; তাহার চেহারা ছিল উদাস-ভাব মাখা; ধর্ম্মকথায় ছিল বৈদান্তিক বিচারের কথা। অন্নদাবাবু গ্রাম্য একজন ধর্ম্ম প্রাণ ভদ্র মহিলার নিকট যাহা শুনিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন তাহা তাহার চিন্তার সীমাকে অতিক্রম করিল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। সাক্ষাৎ হওয়ার পর ব্রহ্মজ্ঞ-

মা অন্নদাবাবুকে ধর্ম্ম জানার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শান্তি কিসে মিলে, মানুষের পরিণতি কি?" ইত্যাদি। বাস্তবিক অন্নদাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরই ব্রহ্মজ্ঞ-মা সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা ক্রমশঃ লোকসমাজে বিস্তার লাভ করিল। অন্নদাবাবু ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা করিতে না পারিয়া তাহাকে তিনি ভক্তিবাদ অনুযায়ী ধর্ম্ম-কথা ও উপদেশ বাণী শ্রবণ করাইলেন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-মা তখন কথার সুযোগে সাধনার উচ্চ ভাব বিন্যাসে অন্নদাবাবু ভ্রান্তি সংশোধন ক্রমে, জ্ঞান তত্ত্বের মহিমা বর্ণনা করেন এবং জীব-জগৎ কল্পনা সম্ভূত, মনের কল্পনা বশতঃই ভ্রান্ত জগতের উৎপত্তি এবং ত্রিতাপ দুষ্ট জগতের দুঃখ-কষ্ট ও জন্ম-মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কল্পনা-পরিত্যক্ত মনের স্থিরতা সাধনের আবশ্যকতা, আমরা অস্থির বলিয়াই জগৎ-মরীচিকা অবলোকন করি—কল্পনা ত্যাগ না হইলে চিরশান্তি মিলিতে পারে না ইত্যাদি জ্ঞান-তত্ত্বের গভীরতম কথা সকল বলিয়া তাহার বিস্ময় ও কৌতুহল উৎপন্ন করিলেন। ভক্তিবাদে —ভক্ত কোন ভগবানের পূজা করে, ভগবান আত্মা ভিন্ন অন্য বাহ্যিক অস্তিত্ব নহে, পূজার পরিণতি কি—আত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতু ও উপায় ব্যতীত বাহ্যিক পূজা নিরর্থক ইত্যাদি কথায় শ্রোতারা অভাবনীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া পড়িল। অন্নদাবাবু তাঁহার কথা অনুচিন্তন দ্বারা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস (১৩২০ বাং) লেখক ও অতুল চন্দ্র ভৌমিক

দুই জন যুবক কলেজে অধ্যয়ন করিত। গ্রীষ্মাবকাশে তাহারা নিজ জন্মভূমি বায়েক গ্রামে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে অন্নদা বাবু তাহাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অদ্ভুত চরিত্রের কথা ও তাঁহার উপদিষ্ট জ্ঞান-বিচারের কথা উল্লেখ করেন। তখন তাহারা ব্রহ্মজ্ঞমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল ও উৎসুক হইল। অন্নদাবাবুর কথানুসারে একদিন উক্ত যুবকদ্বয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দর্শন লাভার্থ সাচার গ্রামে উক্ত জমিদার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ মাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে ভোর বেলায়ই তথায় উপস্থিত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাহার চিরাভ্যস্ত অভ্যাসের ফলে নিদ্রা হইতে গৌণে উঠিতেন। তিনি চিরদিনই রাত্রিবেলা খুব কম নিদ্রা যাইতেন, রাত্রির নিস্তব্ধতায় ও নির্জ্জনে আত্ম-চিন্তা করা তাঁহার স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। তিনি রাত্রিবেলাকে তত্ত্ব চিন্তা করার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া মনে করিতেন; তিনি অনেক সময় আমাদের নিকট বলিতেন "রাত্রিবেলা আত্ম-চিন্তার উৎকৃষ্ট সময়; এমন সুন্দর নিস্তব্ধ রাত্রিবেলা মানুষ শুধু ঘুমে সময় কাটায়, ইহা বড় আপশোষের কথা। একে মোহ নিদ্রা এবং তদুপরি এত অযথা নিদ্রা যদি আসে তবে তত্ত্ব-চিন্তার আর সময় কোথায়?" এই জন্য তিনি রাত্রিবেলাকে আত্ম-চিন্তার পক্ষে সুন্দর সময় বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং রাত্রিতে কম ঘুম যাইতেন বলিয়া ভোরবেলা শয্যা হইতে গৌণে গাত্রোত্থান করিতেন। অন্নদাবাবু ও উক্ত যুবকদ্বর জমিদার বাড়ীর দ্বিতলে এক প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিয়া রহিল। ব্রহ্মজ্ঞ-মা

প্রায় প্রহরেক বেলার সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়াই এসংবাদ জানিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। দর্শনার্থী যুবকদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি, দীপ্তিময় দেহ ও উদাস ভাব বাস্তবিকই বড় চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রতীত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ-মা ক্ষণেক পরে উক্ত যুবকদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্নদাবাবু বলিলেন যে অতুল তাহার সহোদর ভ্রাতা এবং রসিক ও সম্পর্কে তাহার ভাই সে বি, এ ক্লাসে পড়িতেছে এবং অতুল আই, এ ক্লাসে পড়িতেছে। তখন যুবকেরা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের তুষ্ণীভাব কতক সময় নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে ধর্ম্মউপদেশ পাইবার কর্ত্তব্য কি জানার জন্য প্রশ্ন করিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"মাষ্টার মহাশয় আপনার ভাই—বেশ শান্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাদের সাধু ইচ্ছাই মনে হয়। লেখকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"উনি একটু বেশী চালাক।" তখন অন্নদাবাবুই তাহার সঙ্গে গত দিনের আলোচনার সহযোগে গুটি কতক কথার আলোচনা করিলেন—যুবকেরা তাহাই শুনিয়া রহিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা হাতমুখ ধৌত করেন নাই—তাহার অনবসর দেখিয়া অন্নদাবাবু ও যুবকদ্বয় সেদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। বাড়ী যাইবার পথে তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিল। ইহাতে সকলেই এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে ব্রহ্মজ্ঞ মাএর সম্বন্ধে সন্দেহ করার মত কোন ভাব পরিলক্ষিত হইল না,

বরং তাহার দিব্যভাবে ও সরল উক্তিতে তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভূত ধারণার কথাই আলোচিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মজ্ঞ মাকে দর্শন করিবার পর যুবক দ্বয়ের প্রাণে তৃপ্তির অভাব বোধ হইল তাহারা তাহাকে পুনরায় দর্শনের ভাব পোষণ করিল—তখনই তাহারা অন্নদাবাবুর নিকট জানিতে পারিল যে ব্রহ্মজ্ঞ মা এই যুবকদ্বয়কে তাহার সঙ্গে পুনরায় দর্শন করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া যুবকদ্বয় পরদিবস সাচার গ্রামে উপনীত হইয়া রমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটিতে তাঁহার দর্শন লাভ করিল। সেদিন ব্রহ্মজ্ঞ মা যুবক দ্বয়ের মনোভাব পরীক্ষার জন্যই যেন একটু উগ্রভাবে কথাবার্ত্তা বলিলেন। যখন যুবক দ্বয় উপবেশন করিল তখন মা তাহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা কেন আসিয়াছেন?" তাহারা উত্তর করিল—"আপনার দর্শন পাইবার জন্য।" মা বলিলেন—"বাজারে কিছু একটা ঘটিলেও ত মানুষ দেখিতে আসে। আপনারা কি দেখিতে আসিয়াছেন? ব্যাহ্যিক দেখিবার ও শুনিবার হুজুগ বহু লোকেরই হয়।"

যুবকেরা ব্রহ্মজ্ঞ-মাএর এইরূপ কথা শুনিয়া বড়ই চমকিত হইল কিন্তু তাহারা কেবল নীরবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে রসিক বলিল—"আমাদিগকে একটু ধর্ম্মোপদেশ দিন।"

ব্রহ্মজ্ঞ মা উত্তর করিলেন—"উপদেশ ত নিজের মধ্যেই আছে। উপদেশ শুনার জন্য ও জানার জন্য কয়জনের আগ্রহ হয়? আগ্রহ জন্মিলে উপদেশের অভাব হয় না।"

যুবকেরা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সরল কথায় তৃপ্তি বোধ করিল, তাহার কথায় নিজেদের আগ্রহ কি পরিমাণ ইহা ভাবিয়া তাহারা বেশী কথোপকথন করার সাহস পাইলনা। তখন তাহারা বিদায় লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে পর ব্রহ্মজ্ঞ মা বলিলেন— "যাবেনই ত, আর আর একটু বসুন।" তখন ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অহৈতুকী কৃপার পাত্র হইতে পারিবে বলিয়া যুবকদের কোন ধারণা জন্মে নাই, তবু তাহারা কি যেন কি এক অজ্ঞাত প্রেমাকর্ষণের বলে সেখানে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের নিকট বসিয়া থাকিতে আনন্দ পাইল। বেলা বেশী হইতেছে দেখিয়া তাহারা সেদিন বিদায় লইয়া নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেল।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের নিকট যুবকেরা বিশেষ কিছুই এখন পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হয় নাই তবু তাহাদের প্রাণে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল ব্রহ্মজ্ঞ-মাএর কথাবার্ত্তায় কোন লোক-দেখান ভাব নাই; তাহার দিব্য ভাবে সরল প্রেম, তাহার কথায় অকপট ধর্ম্ম-কথা ও তাহার ব্যবহারে নিরপেক্ষ উদাসীন ভাব যেন তাহাদের মনে তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আনিয়া দিল।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা সাচার জমিদার বাড়ীতে অতি-যত্নে ও শ্রদ্ধার সহিত সেবা পাইতেছিলেন। সেই পরিবারস্থ সকলেই মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল; তাহার উন্নত অবস্থার পরিচয় পাইয়া, তাহার তত্ত্বোপদেশ ও ভাব-প্রেরণায় মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাহার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাপরবশ হইল ও তাহার

সমুচিত সেবা ও যত্ন লইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে যাহার চিত্ত উদাসীন, বাহ্যিক জগতের আদর যত্ন যাহার নিকট বালকের ক্রীড়নকবৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া-প্রতীয়মান হইয়াছে তিনি এ সকল বাহ্যিক আদর ও যত্নে কিছুতেই মজিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তাহার মানসিক উদাসীন গতির অনুকূল ব্যাপারে সতত অনুসন্ধান করিয়া চলিতেছেন; তিনি খুঁজিতে-ছিলেন আত্ম-তত্ব জানার জন্য উৎসুক লোকসমাজ-যেখানে তাহার মন তৃপ্তি পাইবে, চিত্ত সান্তনা লাভ করিবে। তাহার মন ছুটাছুটি করিতেছিল—তিনি একদিন দেড় মাইল হাটিয়া বায়েক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন—আসিবার সময় পাল্কীর ব্যবস্থা করার সময়টুক তিনি অপেক্ষা করিলেন না। চিত্তের উদ্দাম ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বায়েক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন গ্রামের বহির্ভাগে পথেই রসিক ও অতুল তাহার দর্শন পাইয়া পুলোকিত অন্তরে তাহাকে বাটীতে লইয়া গেল। ব্রহ্মজ্ঞ-মা বসুদের বাটীতে অবস্থান করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার আগমন-বার্ত্তা গ্রামের সকলের নিকট পৌঁছিল ঃ তখন ধর্ম্মপিপাসু পাড়া প্রতিবোশিরা তাহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। ব্রহ্মজ্ঞ-মাএর আগমনে তৎকালীন এক আনন্দ উৎসবের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার দিব্য মূর্ত্তি, অলৌকিক উদাসগতি, সুমধুর তত্ত্বোপদেশ সকলের চিত্তকে অদ্ভুত রকমে আকর্ষণ করিল। সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট জন-সমাবেশ পরিলক্ষিত হইল। কেহ কেহ

তাঁহার সরল জ্ঞান উপদেশে মোহিত হইল, কেহ কেহ তাঁহার বিচারের কথায় বিস্মিত হইল। আবার কেহ কেহ তাহার সান্নিধ্য উপভোগ দ্বারাই পরিতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মার গতিবিধি ছিল মাদিরাসক্ত লোকের মত; তিনি কখন কখন লোকের নিকট অনর্গল ধর্ম্ম-কথা বলিতেন, কখন বা তিনি মোটেই কথা বলিতেন না—তিনি উত্থাপিত প্রসঙ্গে শ্রোতারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জটিল বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিতেন। কোন ধর্ম্ম কথার আলোচনায় তাহার বাহ্যিক বাঁধাবিঘ্নের কথা মনে থাকিত না; তিনি সময় ও অসময় ভুলিয়া যাইতেন। উত্থাপিত কোন প্রসঙ্গে তাহার মন বসিলে তিনি এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে ঘণ্টা কতেক একাসনে বসিয়াই আহার নিদ্রা ভুলিয়া সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বহুসময় কাটাইয়া দিতেন। তাহার আহারের সময় ও নিদ্রার কথা অপর লোকেরা স্মরণ করাইয়া দিয়াও বারবার অনুরোধ করিয়া তাহাকে তত্ত্বালোচনা হইতে বিরত করিতে পারিত না। তাহার কথাগুলি ছিল অতীব চিত্তাকর্ষক; ধর্ম্ম উপদেশের যুক্তিগুলি ছিল সরল ও আড়ম্বর বিহীন। ধর্ম্মের ভাণ অথবা আড়ম্বর তাহার উপদেশে স্থান পাইত না। বৈরাগ্যের কথা ও সরল জ্ঞান-বিচারের উপদেশ—যাহাতে ছিল জগতের অনিত্যতা, মৃত্যু-চিন্তা—সকলকে মোহিত করিয়াছিল; সকলেই তাহার উপদেশে চির-শান্তি পাইবার পথ সহজে খুজিয়া লইবার সুবিধা পাইল। আত্ম-

চিন্তাই মানব জীবনের মুখ্য গতি এবং বৈরাগ্যই সাধনার বস্তু—মনই জ্ঞান আহরণ করে, বাহ্যিক আড়ম্বর ধর্ম্মের অঙ্গ নহে—এই সকলই তাহার উপদেশের মূল কথা ছিল। কোন বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেন ;. তিনি অযথা তর্ক বিতর্ক করা মোটেই পছন্দ করিতেন না এবং নিজের ভাব প্রকাশ করার প্রবৃত্তি তাহার আদৌ ছিল না—তাহার উপদেশে কোন নিরস ভাব পরিলক্ষিত হইত না। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেক সাধু মহাপুরুষদের সমালোচনা হইত ; তিনি তৎসকল শান্তভাবে শুনিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কোন কথার উত্তর দেওয়ার অভিরুচি জন্মিলে উত্তর করিতেন। তিনি জ্ঞান পন্থাই সমাদর করিতেন কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন মতবাদ বা ভিন্ন ধর্ম্মপন্থার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন না—বরং সে সকল কথার সূত্রপাত হইলে তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি প্রদান করিতেন। একদা স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্ম-পদ্ধতি যুবকদের নিকট আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞ মা তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে পরমহংস রামকৃষ্ণ ছিলেন সাগরসদৃশ এবং তথা স্বামী বিবেকানন্দ নদী বিশেষ রূপে গণ্য হইতে পারে। এ স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ মা রসিক প্রভৃতি যুবকের নিকট হইতে অনেক সময় বৈরাগ্য বিহীন তর্কের কথাও শুনিয়াছেন যুবকদের সরল বুদ্ধিতে ঐ সকল তর্ক অমূলক হইলে তিনি তাহাতে খেয়াল করিতেন না তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন

বলিয়া তাহাদের প্রাণে বৈরাগ্যস্পৃহা জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

এইসময় ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবের কথা শুনিতে পাইয়া নানা স্থান হইতে লোক তাহাকে দর্শন করিতে আসিতেছিল। ইলিয়টগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সারদা চরণ রায়, সুরেন্দ্র নাথ দত্ত নামক জনৈক গ্রাজুয়েট শিক্ষক, প্রফুল্ল চন্দ্র ভৌমিক ও কালিচরণ আইচ প্রমুখ লোক সমূহ তৎকালে তাহার সন্দর্শনে ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। সারদা বাবু ব্রহ্মজ্ঞ মা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট কথাগুলির নোট রাখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাল। সুরেন্দ্র বাবু মাএর অদ্ভুত দেব-ভাব নিরীক্ষণে তাহা প্রচার করার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। কালী বাবু ব্রহ্মজ্ঞ মা-এর সাক্ষাৎ দর্শন ও উপদেশ লাভকে তাহার জীবনে বহু সাধু মহাপুরুষের দর্শনাদি ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ মা কতক দিন এইরূপ মাতোয়ারা হইয়া সকলকে তদীয় ভাবাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লোকের প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-বারি সিঞ্চন করিয়াছিলেন। তখন তিনি নির্জ্জনে থাকার পক্ষপাতী হইলে ও নির্জ্জনে থাকার সুযোগ পাইতেন না। লোকজন সরিয়া পড়িলে মধ্যরাত্রিতে কখন কখন তিনি নির্জ্জন স্থানে দুই এক জন নির্ব্বাচিত ভক্তসহ বেড়াইতে যাইতেন—তখন একটু বিশ্রাম লাভের জন্য, নিজের স্বীয় ভাবে কতক সময় শান্তি উপভোগের জন্যই এই

ভাবে স্থানান্তরে ছুটিয়া যাইতেন—লোক গঞ্জনা অসহ্য বোধ হইলে অধীর ভাবে ঘরের বাহির হইয়া পড়িতেন। তখন একদা গভীর নিশীথে অতুল ও রসিকের সহযোগে উন্মুক্ত প্রান্তরে পদাচরণ কালে ব্রহ্মজ্ঞ মা সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া রসিক তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল—তাহার সমাধির ভাব এই প্রথম উক্ত যুবকদের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছিল। তখন পূর্ণিমার চাঁদ দশদিক বিস্তার করিয়া তাহার অংশুমালা ছড়াইয়া দিয়াছিল—রাত্রির নিস্তব্ধতায় প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহ যেন উৎসুক নয়নে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দিব্য সমাধি মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল। রসিক মাএর মনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল—"আহা কি সুন্দর চন্দ্র কিরণ! এই পূর্ণিমার চাঁদ কত মনোহর!" প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মজ্ঞ মা বলিলেন—"দরিদ্র লোকের ছেলেরা সামান্য একটু গুড়-মিষ্টি পাইলেই খুসী হয়; এই সৌন্দর্য্য হইতে ঢের বড় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে—ঢের বড় আনন্দ রহিয়াছে।"

লোকোত্তর মহামানব সমাধির উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মানন্দে জীবন সার্থক করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় ও অনুপম আনন্দ উপভোগ করে ব্রহ্মজ্ঞ মা এর উক্তি তাহাই ইঙ্গিত করিল। স্বীয় উপলব্ধি বলে অসীম আনন্দ-ধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা জীব জগতকে তাহা দিবার জন্য অধীর প্রাণে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাহার দিব্য প্রেরণায় লোকসমূহ সাময়িক আনন্দে ভাসিল—কিন্তু মহামায়ার কুহকে সে পথে সে ভাবে কয় জন বিষয়-ভাব বিসর্জ্জন দিয়া ছুটিল! বিষয়-তৃষ্ণা

ও মায়া মোহ এত দুর্লঙ্ঘনীয় বলিয়াই যুগে যুগে অবতীর্ণ মহা মানবের আহ্বানে ও সুপ্ত জন-মণ্ডলীর চেতনা জন্মে না।

ব্রহ্মজ্ঞ মা ভাবাবেশে বিচরণ কালে লোকের প্রাণে তৎসময় এমন এক আকর্ষণ বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন যে যুবক ও বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ, জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকল লোকই তাহার দর্শন, তাহার সান্নিধ্য লাভ, তাহার সহযোগে ধর্ম্মালোচনায় এক অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছিল। তিনি বায়েক গ্রাম হইতে সাচার প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এই সংবাদ শুনিয়া গ্রামবাসীরা ব্যাকুল হইল এবং তাহার প্রত্যাগমনের দাবী রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহাকে বিদায় দিল।

তখন আষাঢ় মাস আসন্ন। ব্রহ্মজ্ঞ মা দেশ বিদেশ ভ্রমণের আকাঙ্খায় অধীর-মনা হইয়া কলিকাতা যাইবার অভিসন্ধি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ধীরেন্দ্র তৎকালে কলিকাতা অধ্যয়ন করিত তাহার কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার সময় ব্রহ্মজ্ঞ মা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—তখন ধীরেন্দ্র হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে তিনি তখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিলেন না, পরে তিনি যুবক ছাত্র রসিক প্রভৃতির সঙ্গে কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন অন্নদা বাবু পিতৃ শ্রাদ্ধ করার মানসে কলিকাতা হইয়া গয়াধামে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক হইল—ব্রহ্মজ্ঞ মা এই সকল লোকের সহযোগে কলিকাতা যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর

হইলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহার পিতা অভয়া চরণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার কলিকাতা যাওয়ার পথে নানারূপ বিঘ্ন ও বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে বাধা দিতে চাহিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ-মা উপযুক্ত বসতি স্থানের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত সেবাকারী ব্যতীত এই ক্ষীণ দেহে পর্য্যটনে বহির্গত হইলে তাহার দেহ-ধারণ দুরূহ হইবে ভাবিয়া তদীয় পিতৃদেব তাহাকে বার বার বাধা দিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-মা চিরদিনই স্বাধীন-মনা ছিলেন—তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় কেহ কোন বাধা জন্মাইলে তাহাতে তিনি নিরস্ত থাকিতেন না। যাহার মন সুখ ও দুঃখে ভীত নহে, কোন বাসনা জালে দুর্ব্বল নহে সেই নির্ভীক চিত্ত লোকের স্বাধীন গতি-ধারা কোন যুক্তি তর্কে নমনীয় হয় না। বাসনাই চিত্তকে পরাধীন করে; সুখের আশাই হৃদয়কে দুর্ব্বল করে। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের পিতৃদেব তাহার প্রতি স্নেহাতিশয্য বশতঃ দেখাইলেন যে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের স্বাস্থ্য ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, এবং গতিবিধি করার পক্ষে অনুকূল অর্থবল ও লোকবল না থাকাতে তাহার পক্ষে দূরদেশে ভ্রমণ করা অতীব বিপদপূর্ণ ও সঙ্কট ময়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মা উত্তর করিলেন "ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়; অর্থ বিত্তহীন হইলেও প্রবল ইচ্ছা জন্মিলে কোন ঠেকা পড়ে না; প্রবল ইচ্ছাকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।" তখন অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী তাহার কন্যার অসীম মন-বলের কথা স্মরণ করিয়া

তাহাকে কলিকাতা যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে (১৩২০ বাং) ব্রহ্মজ্ঞ মা অন্নদাবাবু ও রসিক, অতুল প্রভৃতি অধ্যয়নার্থী যুবক ভক্তগণ সহযোগে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পথে তাহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইল—কলিকাতা পৌঁছিবার পর কোন সুনির্দ্দিষ্ট বসতি করার বাড়ী না থাকাতে সেখানে ও অনেক ক্লেশ পাওয়ার কারণ উপস্থিত হইল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মা এর ইচ্ছাই ছিল সর্ব্ব প্রতিকূলতার উপর দণ্ডায়মান পথ প্রদর্শক। সেই জন্য তিনি কোন কাজে বা উদ্দেশ্যে ব্রতী হইলে কোন লাঞ্ছনা বা দুঃখের জন্য ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কলিকাতা নগরীতে কোন বাড়ীর বন্দোবস্ত না থাকাতে কলিকাতা পৌঁছিবার পর সঙ্গীয় অনভিজ্ঞ যুবক ভক্তদের বুদ্ধিহীনতার নিমিত্ত তাহাকে অনেক শারীরিক অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তাহার আহারাদি ও বাসস্থান সম্পর্কে কোন কথা বলিতেন না—এই সকল ব্যাপারে তিনি উদাসীন মন-গতি নিয়াই চলিতেন। ধীরেন্দ্র পূর্ব্বে কলিকাতা আগমন করিয়াছিল; তাহার অনুসন্ধানে কোন পৃথক বাড়ীতে থাকার সুবিধা করিতে না পারায় ব্রহ্মজ্ঞ মা তাহার মেস বাড়ীতে অবস্থান করিবার জন্য উঠিলেন—কিন্তু সেখানে থাকার সুবিধা না হওয়াতে ধীরেন্দ্রের জনৈক আত্মীয়ের বাসা বাড়ীতে তাহার অবস্থানের আয়োজন করা হইল (মানিকতলা ষ্ট্রীটে)। সেখানে অবস্থান কালে যুবক ভক্ত ধীরেন্দ্র, রসিক, হরিপ্রসাদ

প্রভৃতি তাহার তত্ত্বাবধান করিত। ব্রহ্মজ্ঞ মা যে ইচ্ছা ও আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া নানাস্থানে ছুটাছুটি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্যে বুঝিবার ক্ষমতা যুবক ভক্তদের বুদ্ধিতে সমুপস্থিত হয় নাই। তিনি কি ভাবে কোন অভিসন্ধি বলে তাহার সুমহতী ইচ্ছাশক্তিকে কার্য্যকারী ভাবে পরিণত করিতে পারিবেন ইহা ভাবিয়াই ভক্তদের সঙ্গে বসতি করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন—কিন্তু ভক্তদের দুর্ব্বল মনের আয়োজনে তাহার থাকার ও খাওয়ার অসুবিধা ও কষ্ট হইতেছিল। তিনি ফল মূল খাইয়া পাঁচ সাত দিন কাটাইলেন তবু তাঁহার আহারের জন্য বন্দোবস্ত করার চেষ্টা ভক্তদের মনে জাগিল না। তিনি বলিতেন "আমার সামান্য একটু কিছু আহারের ব্যবস্থা হইলেই চলিবে—থাকার পক্ষে বিষয়ী লোকজনের সংস্পর্শহীন একটু পবিত্র আবাস জুটিলেই বিশেষ।" কিন্তু অনভিজ্ঞ ভক্ত যুবকেরা ভাবিল যে মা এর অসীম মন বলে কোন অব্যবস্থা হইলেও তাহা সহিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার ফলে তাহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইল ইচ্ছানুযায়ী চলা ফেরা করার অভাবে মানসিক উদ্বিগ্নতা ভক্তদের মন-বুদ্ধির অন্তরালে তাহাকে ব্যথিত করিল। তবু তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। অত্যন্ত অসুবিধার ভিতর তিনি প্রায় দুইমাস কাল কলিকাতা অবস্থান করিলেন; তখন কলিকাতাস্থ তদীয় যুবক ভক্তগণ সহ তিনি যথাসাধ্য পরিভ্রমণে আত্ম-তৃপ্তি লাভের প্রয়াস করেন। তৎকালে তাহার তত্ত্বাবধানকারী যুবকভক্ত

রসিক, হরিকমল, ধীরেন্দ্র, হরিপ্রসাদ, রমেশ প্রভৃতি সহযোগে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন একদিন নিমতলা ঘাটে জনৈক ভৈরবী সাধুর নিকট গমন করিয়া তথাকার অবস্থা দর্শন করেন। সাধু-ভক্তদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা ও তাহার মনের তীব্র ইচ্ছার কাজ ছিল না—ভক্তদের প্রাণে অভিজ্ঞতা জন্মাইবার অভিপ্রায়েই তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণাদি করেন। তিনি সর্ব্ব প্রথম বাগবাজার স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে যান। তখন স্বামীজি বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞ-মা এর সঙ্গে ছিল—রসিক, অন্নদাবাবু, ধীরেন্দ্র, হরিপ্রসাদ, রমেশ, হরিকমল প্রভৃতি ভক্ত যুবক। মা এর উদ্দেশ্য ছিল ভক্তদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। ব্রহ্মজ্ঞ-মা এর প্রতি তাহাদের ধারণা ইত্যবসরে উচ্চ সীমানায় পৌঁছিয়াছিল এবং তাহারা তাঁহার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া এই ভাবিল যে স্বামীজির সঙ্গে তাহার কথোপকথনে ভারী রহস্যের উদ্ঘাটন হইবে। কিন্তু বাহ্যিক সাময়িক আলাপে সে ভাব ধরা পড়া সম্ভাব্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞ মা এর ইচ্ছা ছিল ভক্তদের প্রাণে বিশ্বাসের মাত্রা প্রবৃদ্ধির হেতু উদ্ভাবনা তখন ভক্তগণ সহ ব্রহ্মজ্ঞ মা বলরাম বসুর দ্বিতল বাড়ীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎ হওয়ার পরই মা বলিলেন যে তাহার কয়েকটী কথা বলার ইচ্ছা এবং তিনি নির্জ্জনে স্বামীজির সঙ্গে কথোপকথন করিতে ইচ্ছুক। তখন স্বামীজি তাহার পরিচয়

জানিয়া সঙ্গীয় ভক্তদের অসাক্ষাতে মা এর সঙ্গে ঘণ্টা খানেক আলাপ করেন। আলাপান্তে স্বামীজি বাহিরে আসিয়া বলিলেন (ভক্তদের প্রতি চাহিয়া) তাঁহার সম্যক্ সেবা যত্ন লইবেন, নতুবা শরীর টিকিবে না। নিজ বাড়ীর লোক দিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—উনি একজন "খুব উচ্চ সাধু, তাঁহার জল-যোগের ব্যবস্থা করিয়া দেও" সেদিন তখন দুপুর আসন্ন দেখিয়া সঙ্গীয় ভক্তগণ সহ ব্রহ্মজ্ঞ মা বিদায় গ্রহণ করেন। ইহার কতক দিন পরে ব্রহ্মজ্ঞ মা পুনরায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দর্শন ও কথোপকথন করেন।

একদিন ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের বেলুর মঠ দর্শনের প্রবল ইচ্ছা জন্মিল এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও নিজ ইচ্ছার প্রেরণায় ভক্তগণের সহযোগে নৌকাযোগে বেলুর-মঠে পৌঁছিলেন। বেলুড় মঠে পৌঁছিবার পর তথাকার সংবাদ কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মা সোজাসুজি মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দকে দূরে অবস্থান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া তিনি স্বামীজির সঙ্গে কথোপকথনে নিবিষ্ট হইলেন। তাহার সঙ্গীয় ভক্ত রসিক, ধীরেন্দ্র, হরি কমল, রমেশ সেন, অন্নদাচরণ ভৌমিক তখন নাতিদূরে খোলা জায়গায় ঠিক বিবেকানন্দ মহারাজের সমাধি মন্দিরের নিকট উপবেশন করিয়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপভোগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ-মা এর আদেশ অপেক্ষা করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। ইত্যবসরে স্বামী প্রেমানন্দজীর সুললিত কণ্ঠস্বরে

গীত গানের—"কবে মোর সমাধি হবে ইত্যাদি"—শব্দ তাহাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। ভক্তগণ তখন ভাবিল ব্রহ্মজ্ঞ-মা তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সহযোগে মনের বিমল আনন্দ ধারার আস্বাদন লাভে আনন্দ পাইতেছিলেন; ব্রহ্মজ্ঞ-মা বিষয়-কথা, বিষয়ী লোকের ভাব পছন্দ করিতেন না ঃ অসুবিধায় পড়িয়া লোকালয়ে বিষয় সংস্পর্শে বসতি করিলেও তাঁহার মন অতি উর্দ্ধ রাজ্যে বিচরণ করিত এবং সুযোগ পাইলে ও বহির্ভাগে চলিয়া যাইত। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্রহ্মজ্ঞ-মা ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজজির কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল—তৎপরে ভক্তগণ আহূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ মাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা-বক্ষে নৌকাযোগে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া কলিকাতা মহানগরী অভিমুখে চলিল। গঙ্গা-বক্ষে চলিবার সময় ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের গম্ভীর দেব-দীপ্ত চেহারা, অপূর্ব্ব তুষ্মী-ভাব সঙ্গীয় ভক্তদের মনে অপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করিল ঃ অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন যুগল ও হাস্যস্ফীত ওষ্ঠধারা প্রত্যক্ষ করিয়া মা এর দিব্য মুর্ত্তিতে ভক্তগণ কি যে রহস্য দেখিতে পাইল তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণ (রসিক, হরিকমল প্রভৃতি) পর সময়ে বর্ণনা লালসে কাহার নিকট বর্ণনা দিতে অভিলাষী হইলেও ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। কলিকাতা পৌঁছিয়া বাস-স্থান অনুসন্ধান করিয়া লওয়া হইল; তখন রসিক অত্যন্ত কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে বেলুড়ের মহারাজ প্রেমানন্দ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ঃ প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মজ্ঞ-মা স্বামীজির সরল ব্যবহার ও সমাধি গানের অর্থ বুঝাইয়া দেন

স্বামীজির প্রেমানন্দ নাম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মা উক্তি করেন। স্বামীজি নিজের দৈন্য দেখাইয়া বলিলেন "মা, আমার অনেক বন্ধন, স্বামীজির (বিবেকানন্দ) আদেশে মঠের দায়িত্ব নিয়া ব্যাপৃত আছি—কই, মনত এখনও সমাধির রসে মজিল না—ইত্যাদি।" ব্রহ্মজ্ঞ-মা বলিলেন "এমন অনেক সাধু, সন্ন্যাসী ও সাধক আছে যে যাহারা সাধনার কতক স্তর পরিজ্ঞাত হইয়াই পরিতৃপ্ত থাকে এবং অভিমানে মত্ত হইয়া নিজ অসমর্থতা জ্ঞাপন করিতে চায় না। কিন্তু স্বামীজি নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া অনুরাগের বশে সমাধি লাভের আশা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য অনুশোচনা জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর পরমহংস দেবের সম্প্রদায়ের এই বিশিষ্টতা যে এখানে খাঁটী সত্যের ভাব পরিদৃষ্ট হয়—কোন অবিচার ও মিথ্যাচার এখানে নাই।" আমরা ঠাকুর পরমহংস দেবের প্রতি ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করিতাম এই ভাব লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মা বলিলেন—"তোমরা ধারণা করিতে পার না, কাজেই আমি কি বলিব? এই সন্ন্যাসীরা এখনও শেষ-সীমানার অনেক তফাৎ। সাধু সন্ন্যাসী হইলেও মুক্ত-অবস্থা লাভ করিতে অনেক জন্ম কাটিয়া যায়; সকলেই এক জীবনে শেষ সীমানায় পৌঁছিতে পারে না; স্বামী বিবেকানন্দজী ছিলেন পরমহংস দেবের অপূর্ব্ব শিষ্য—বিবেকানন্দ মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া অন্য শিষ্যেরাও এই জীবনেই মুক্ত হইতে পারিবে এমন কথা নয়; সাধনার বহু-স্তর রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ-মা

সত্য-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত করাইবার জন্য এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত এবং বহু অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা মূর্খতা ও মোহ-প্রযুক্ত সেই ভাব পরিস্ফুট আকারে বুঝিতে পারি না ও সত্য তত্ত্ব-পথে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হই না।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা এর তদানীন্তন ভাবে ইহা দেখা যাইত যে তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রয়াসী হইতেন সত্য, কিন্তু ইহা তাহার মুখ্য মন-গতি ছিল না। তিনি নিজ ভক্ত যুবকদের সঙ্গে ও তাহাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ আলোচনায় এবং তাহাদের মন গতির প্রস্ফুটনে তত্ত্ব কথার ব্যাখ্যা করিয়া সমধিক আনন্দ পাইতেন। তাহার সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার ও কথাবার্ত্তা বলার উদ্দেশ্যও ছিল স্বীয় ভক্তগণের কোমল প্রাণে অধ্যাত্ম বীজ বপন করিবার অভিসন্ধি—যাহাতে তাহাদের মনে সন্দেহের নিরসন ঘটে—তাহারা খাঁটী সত্য খুঁজিয়া পাইতে পারে। কোন সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে ব্রহ্মজ্ঞ মা উক্তি করিতেন—"কই ইহাতেও তৃপ্তি বোধ হইল না।" ব্রহ্মজ্ঞমা একে একে তৎসময় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে, বাগবাজারে পৌঁছিয়া শ্রী মার সঙ্গে আলাপ করেন। কিন্তু কোথাও তিনি মনের অনুকূল কথা প্রসঙ্গের অবতারণা পান নাই—কোথাও তৃপ্তি বোধ করেন নাই। সাধারণতঃ মানুষ লোকগুরু লোকোত্তর মহাপুরুষদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাবান হউক ইহা বাঞ্ছনীয়—কিন্তু তাহাদিগকে শিবের অংশ বা বিষ্ণু অবতার মনে করিয়া তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্য মাত্রই

মুক্ত বলিয়া ধারণা পোষণ করিলে নিজ বিচার শক্তির অভাবে স্বীয় দৌর্ব্বল্য টানিয়া লয়, ইহাতে সাধনার পথে নিজের শক্তির অভাব সৃষ্টি করে। মানুষ মাত্রই মুক্তির অধিকারী—মানুষ মাত্রের জীবনই ত্রিগুণাত্মক মায়ার খেলা। সাধনার শক্তিতে মুক্তিরূপ অমূল্য সম্পদ্ মানুষ মাত্রই অর্জ্জন করিতে পারে। এই মুক্তির অধিকারী হওয়া একদিকে যেমন দুর্লভ, অন্যদিকে ইহা সকলেরই অধিকার লব্ধ জিনিস। কেহ কোন মহাপুরুষের শিষ্য বলিয়াই ইহা তাহার পক্ষে সাধনা ব্যতীত উপলব্ধি হইতে পারে না। সাধনার পথ অতি দুর্গম ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া দরকার। সম্যক চেষ্টা ও সাধনা ব্যতীত কোন লোক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথ স্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

কঠোপনিষৎ

ক্ষুরের ধারের ন্যায় সাধনার পথ অতীব বিপজ্জনক ও কষ্ট-সাধ্য —এই জন্য উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় লইয়া সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে; নতুবা ঈপ্সিত স্থান লাভ করা সম্ভবপর হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞ-মা যুক্তি ও বিচার লইয়া উপদেশ প্রদান করিতেন; বিচারহীন কথা তাহার শ্রবণে পৌঁছিলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন। সত্য-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ

ও প্রচেষ্টা ব্যতীত আড়ম্বর পূর্ণ সাধুতা প্রদর্শন তিনি পছন্দ করিতেন না। মানব সমাজ গড্ডালিকা প্রবাহের মত বাহ্যিক ভাবে গা ভাসাইয়া কোথাও অতিবিশ্বাস এবং কোথাও বিশ্বাস হীনতার ভাবে চলিতে থাকে এবং ইহাতে প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার পথে ভুলে পতিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ-মা ভক্তগণকে খাঁটী পথ, খাঁটী মত এবং বিচার-পরায়ণ হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। বিশ্বাসহীন হইলে যেরূপ আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তদ্রূপ অযথা বিশ্বাসাতিশর্য্যে ও নিজ মনগতির দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে এবং ইহাতে উন্নতি লাভে কোন সত্যিকার সহায়তা জন্মায় না।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বীয় প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে তদীয় উদ্দাম মনোভাবের কথঞ্চিৎ বিনিময়ে কিছু কাল কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান করিলেন। অন্নদাচরণ ভৌমিক গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বীয় অভিরুচির বিরুদ্ধে তৎসহযোগে স্বদেশে ফিরিয়া যান। তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা এর মন-গতি বুঝিবার ও তদনুযায়ী তাহার সেবা যত্ন লইবার শক্তি ও ইচ্ছা ভক্তদের মোহগ্রস্থ প্রাণে উদিত হয় নাই। তিনি ভক্তদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন কিন্তু বাহ্যিক আকারে তাহার ভালবাসা ও স্নেহ পরিস্ফুট হইত না— তিনি ভক্ত হৃদয়ে প্রেমাকর্ষণ জনিত আনন্দ ধারা উপভোগ করার মানসেই ভক্তদিগের সহযোগে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন—নিজের কোনপ্রকার স্বার্থ ইহাতে বিন্দুমাত্র ও

ছিল না। তাহার তৎকালীন মন ভাবের সম্যক ধারণা করা কাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বার্থে জড়িত হইয়া ভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অযাচিত অপরিসীম স্নেহের দানে উদাসীন হইয়া চলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৈরাগ্য বিহীন হৃদয়ে পরম তত্ত্ব স্থান পায় না। কোমল আধার যুবক ভক্তগণের ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলেও তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের স্নেহের প্রতি-দান দিতে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক হইল। তখন মা নিরুপায় ভাবিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নিজগ্রামে পৌঁছিবার কয়েকদিন অন্তরই সাচার গ্রামে যাইয়া তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে বসতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জমিদার পরিবারের জনৈক জামাতা সাচার বেড়াইতে আসিয়াছিলেন—তাহার বাড়ী বরিশাল জেলায় নারায়ণপুর গ্রামে। সে ই জামাতা প্রমোদ রঞ্জন সেন ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইল এবং দেশে যাওয়ার সময় ব্রহ্মজ্ঞ মা এর ইচ্ছাক্রমে তৎসহযোগে বরিশাল ফিরিয়া যান তখন শারদীয় দুর্গোৎসব ব্যাপারের কিছু সময় পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞ মা নারায়ণপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজেকে কিছুতেই লোকসমক্ষে ধরা দিতে চাহিতেন না। সাধনার ফলে তাহার মন ভাব এতদূর লুক্কায়িত ছিল যে কতিপয় আত্মীয় স্বজন ব্যতীত অন্যলোকে তাহাকে চিনিতে 'পারে নাই—

আত্মীয়গণও তাহার সাধনার ও উচ্চ মন-গতির আংশিক ভাব মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিল। নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থানের সময় তথাকার গ্রাম্য নেতা উমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহযোগীতায় বহু শিক্ষিত ও ধর্ম্মভাবাপন্ন লোক ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের উপদেশ লাভে মোহিত হন এবং বহু তত্ত্বালোচনায় দিনকতক আনন্দ-ধারায় অতিবাহিত করেন। তাহার অপূর্ব্ব তত্ত্ব-বিচার চিত্ত-বিনোদক কথোপকথন ও স্নেহাকর্ষণ বহু লোকের মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তথাকার লোকেরা ব্রহ্মজ্ঞ মাকে সেখানে অধিকতর সময় থাকার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু তিনি কলিকাতা নগরীতে অবস্থানের ইচ্ছা প্রবলভাবে পোষণ করাতে পূজার ছুটির পর প্রমোদ রঞ্জন সেনের সহযোগে কলিকাতা আসেন। মুক্ত মহাত্মাদের অন্তর নিহিত গূঢ় রহস্য অন্য লোকেরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝিয়া লইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজ মন-গতি চাপা দিয়া ধর্ম্ম কথার ফোয়ারার স্রোতে ভাসিয়া ধর্ম্ম প্রাণ লোক সকলের নিকট সমাদৃত হইয়া চলিলে ও তাঁহার লুক্কায়িত মনভাব ছিল—প্রিয় ভক্তগণ সহযোগে প্রেম রসানুভূতি অনুভব ও তদনুকূল প্রচেষ্টা প্রবৃদ্ধির হেতু উদ্ভাবন। এইজন্য তিনি কোথাও অবস্থানের পক্ষপাতী হইলেন না, কাহারও শ্রদ্ধার দানে আকৃষ্ট হইলেন না। যখন যেখানেই অবস্থান করিতেন সেখানেই তথাকার ধর্ম্মপ্রাণ লোক সকলের সহযোগে জ্ঞান ও তত্ত্ব কথার অবতারণা দ্বারা অপূর্ব্ব আনন্দ ধারার সৃষ্টি করিতেন।

অনুরাগী মুমুক্ষু ভক্তগণের সঙ্গে তত্ত্ব-কথার সূত্রপাত হইলে তিনি তাহাতে আহার নিদ্রা ভুলিয়া সময় কাটাইতেন এবং তত্ত্ব কথার প্রসঙ্গে সমাধি রসে ডুবিয়া দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিতেন। সেই সমাধি ভাব ছিল অতি মাধুর্য্যময়—চিত্র-পুত্তলিকার অবস্থায় কখন অল্প সময়, কখন বহু সময় নিমগ্ন থাকিয়া নিদ্রোত্থিত শিশুর মত কি যেন কিছুর আব্‌দার করিয়া, সময় সময় ভক্তগণের অনুনয় বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া তিনি প্রাকৃতিক অবস্থায় পৌঁছিতেন। শিশু যেরূপ নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় তাহার প্রিয় জিনিষ বা প্রিয় জনের আভাস খুঁজিয়া লয়, ব্রহ্মজ্ঞ মা সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার সময় আলোচিত তত্ত্ব কথার অথবা প্রিয় ভক্তের অনুসন্ধান লইতেন। সে সময় ব্রহ্মজ্ঞ মা তাহার প্রিয় ভক্ত রসিকের কথাই বেশী বলিতেন এবং সমাধি ভঙ্গের জন্য তাহার খোঁজ লইতেন। ব্রহ্মজ্ঞ মা তাহার ভক্তগণের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিলেও তাহার মায়াজালে আবদ্ধ জীবের মত ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের আহ্বানে সারা দেয় নাই এবং অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু মায়ের প্রতি অনুরাগ পরবশ হয় নাই। চিন্তা করিলে ইহা অনুমিত হয় যে মানুষ সাধারণতঃ ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ইচ্ছা ও আবেগ প্রদর্শন করিলেও হৃদয়ে অনুরাগ ও বৈরাগ্যের সঞ্চার না হইলে ভগবানের দেয় ঐশ্বর্য্যও দূরে ফেলিয়া চলিতে চায়। ব্রহ্মজ্ঞ মা তদীয় ভক্তগণের প্রাণে ধর্ম্মের ভাবপ্রসারণ করিবার মানসে নিজ শারীরিক দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া

কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থানের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কলিকাতা অবস্থানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা কোন ভক্ত দ্বারাই কার্য্যকরী হইল না। ব্রহ্মজ্ঞ মা কতিপয় দিবস ভক্ত ধীরেন্দ্র সেনের মেস বাড়ীতে এবং কতক দিবস ভক্ত রসিক বসুর মেস বাড়ীতে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া বসতি করিলেন। মা কলিকাতা বস-বাসের জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রদর্শন করিলেও তাহার সুগম পন্থা নির্ণয়ের জন্য কোন ভক্তের মনে স্বার্থ-ত্যাগের ভাব ও যথাসাধ্য চেষ্টা করার ইচ্ছা উদয় হয় নাই। সম্মুখে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইয়াও খেলায় উন্মত্ত শিশু যেমন ক্রীড়াপুতুল পাইতেই লালায়িত হয় তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অযাচিত প্রেমকণা হৃদয়ে পোষণ করিবার প্রয়াস ভক্তদের প্রাণে উদিত হয় নাই। তৎকালে রসিকের সম্মুখে ছিল বি, এ, পরীক্ষার দায়িত্ব এবং ধীরেন্দ্র কলেজের পঞ্চম বর্ষীয় ছাত্র ছিল ও মায়ের অন্যতম প্রিয় ভক্ত অতুল কুমিল্লা সহরে আই, এ, পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিল। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের ইচ্ছানুকল্পে কোন ভক্তই মাকে কলিকাতা বস-বাসের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য প্রচেষ্ট হইল না। মা তৎসময় মেস বাড়ীতে বসতি করিতে অত্যন্ত অসুবিধা ও শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন দেখিয়া তদীয় ভক্তগণ তাহাকে কুমিল্লা পাঠাইবার জন্য আয়োজন করিল। মা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলিকাতা নগরী পরিত্যাগ করিলেন। ভক্ত অশ্বিনী মজুমদার মাকে কুমিল্লা নেওয়ার ভার গ্রহণ করিল। ভক্তগণের জন্য তাহার তৎকালীন স্নেহাতিশয্য ও করুণার দৃশ্য

অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তিনি ভক্তগণের নিকট বিদায় লইবার সময় তাহার সকরুণ দৃষ্টি সকলের প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা কুমিল্লা নগরীতে পদার্পণ করিবার পর ভক্ত অতুলের সেবা যত্নে উকীল শরৎচন্দ্র ভৌমিকের বাসা-বাড়ীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। তখন তথাকার ধর্ম্মপ্রাণ লোকজন তাঁহার অনুসন্ধান পাইয়া তাহার দর্শন লাভ করিল এবং তত্ত্ব কথার আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের গভীর বিচারপূর্ণ উপদেশ লাভে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল। মায়ের কথা প্রচারের কোন আয়োজন ছিল না এবং ব্রহ্মজ্ঞ মা ধর্ম্মের আড়ম্বরও পছন্দ করিতেন না। সুতরাং অনুরাগী ধর্ম্ম-পিপাসু লোকেরাই মায়ের দর্শন লাভ করিবার প্রয়াস পাইল এবং তাহার সুগভীর অদ্বৈত-তত্ত্ব পরিপূর্ণ বিচার ও উপদেশ শুনিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইল।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা মনে মনে খুঁজিতেছিলেন ভক্ত সমাগম। তিনি বৃথা ধর্ম্মের আড়ম্বর দেখিলে বিরক্তি বোধ করিতেন। খাঁটী ধর্ম্ম পিপাসু লোক পাইলে তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্ম কথার অবতারণা করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞ মা যে সময় শরৎ বাবুর বাসা বাড়ীতে ছিলেন তখন জিলা স্কুলের শিক্ষক বিশ্বেশ্বর দাস মায়ের দর্শন লাভ করেন। বিশ্বেশ্বর বাবু অতুলের শিক্ষক ছিল এবং কার্য্য প্রসঙ্গে শরৎ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা তাহাকে দেখিয়া তাহার চিত্তের সরলতা বুঝিয়া তাহাকে অনেক তত্ত্বকথা ও উপদেশ শুনাইলেন। কথা

প্রসঙ্গে এরূপ অপূর্ব্ব ও কৌতুহলোদ্দিপক ধর্ম্মোপদেশ বিশ্বেশ্বর বাবুকে মোহিত করিল। বিশ্বেশ্বর বাবু ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অমৃত তত্ত্বোপদেশ হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শণ করিতে লাগিল এবং সহরের লোকজনের নিকট মাএর অদ্ভুত কথা জানাইল। বিশ্বেশ্বর বাবু ঠাকুর পরমহংস দেবের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "শান্তি-সুধা" নামে একটী পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিল এবং উক্ত গ্রন্থের একখানি পুস্তিকা মাকে উপহার দিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা উপস্থিত ধর্ম্ম পিপাসু লোকজনের সঙ্গে ধর্ম্ম-কথা আলোচনা দ্বারা সকলের চিত্তে আনন্দ বিতরণ করিতেছিলেন এবং লোকজনও তাঁহার উচ্চ ভাবের পরিচয় পাইয়া তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। কিছুদিন এই ভাবে অতীত হইলে ব্রহ্মজ্ঞ মা অতুলের জনৈক আত্মীয় গোপীমোহন চৌধুরীর বাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোপীবাবুব স্ত্রী ধর্ম্মপ্রাণ মহিলা ছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অলৌকিক জ্ঞান ও বিচারে মোহিত হইয়া সে মাকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। মা তখন তথাকার সেবা যত্নে সেই বাড়ীতে কতক দিবস অতিবাহিত করেন। গোপীবাবুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের কথা শ্রবণ করিয়া অমর দাস ও অবনী ব্যানার্জি নামক দুই জন সহরবাসী ভদ্রলোক মায়ের দর্শন লাভ করিল এবং মায়ের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। মায়ের অচিন্তনীয় ভাব-ধারায় ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া অবনীবাবু তৎপ্রতি

শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া তাহাকে নিজ বাসা-বাড়ীতে লইয়া গেল এবং অমর দাসের ঘরে ব্রহ্মজ্ঞ মা বসতি করিতেছিলেন। মায়ের প্রতি অমরের সরল ভক্তি ও সেবা করিবার আগ্রহাতিশয্য প্রশংসনীয় ছিল। তখন কুমিল্লা নগরীর ধর্ম্মপিপাসু জনমণ্ডলী ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অপূর্ব্ব তত্ত্ব-কথা ও জ্ঞান বিচারের পরিচয় পাইয়া দলে দলে অমর চন্দ্র দাসের বাসা বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল এবং দিনের পর দিন ব্যাপিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের উপদেশে মাতোয়ারা হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতের ধারা সৃষ্টি করিল। সহরের খ্যাত নামা ধর্ম্ম প্রাণ অধ্যক্ষ রাধা গোবিন্দ নাথ, উকীল দ্বারকা নাথ ব্যানার্জি, নরেন্দ্র চন্দ্র দেব প্রমুখ বহু লোক তাহার দর্শন, তদীয় মীমাংসিত ধর্ম্ম কথা অসীম বিচার পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্ব শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া ধর্ম্ম কথা আলাপ ও আলোচনা দ্বারা মাসাবধি অপূর্ব্ব আনন্দে অতিবাহিত করিল। তখন অনেক ধর্ম্ম-প্রাণ মহিলা তাহার সঙ্গে অবাধ আলাপ ও আলোচনা দ্বারা ধর্ম্ম ও তত্ত্ব রসের আস্বাদনে পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল—বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অসীম জ্ঞান ও তত্ত্বের পরিচয় পাইয়া নিয়তই তাহার দর্শন ও তদীয় অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা জনমণ্ডলীর অনুরাগ ও আগ্রহে গা ঢালিয়া আহার নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দিনের পর দিন মহোল্লাসে তত্ত্ব স্রোত উৎপন্ন করিয়া লোকসমূহের চিত্তকে মোহিত করিলেন। সেই স্রোতে অবনী মোহন ব্যানার্জি

ও অমর চন্দ্র দাস ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অমূল্য উপদেশের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয় লইল। কিছু দিন এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের স্বাস্থ্য জন-স্রোতের অত্যধিক গঞ্জনার আঘাতে রুগ্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার স্বাস্থ্য নিয়ম রক্ষার অনুকূল ব্যবস্থার অভাবে এবং ততোধিক স্বাস্থ্য-বিধির প্রতি তাহার নিজস্ব উদাসীনতা ভক্তগণের মনে তাঁহার স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তার বুদ্ধির উদ্রেকের অভাবে তিনি গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবসর বিনোদনে বা রোগ-যাতনায় সমাধি ভাবে কাল যাপন করিতেন। তখন ভক্তগণ তাহার মনের ভাব বুঝিত না এবং তিনি শারীরিক বিষয়ে উদাসীন বলিয়া শরীরের যত্ন নেওয়ার ভার যে ভক্তগণেরই কর্ত্তব্য তাহা সঙ্গীয় ভক্তগণের মূর্খতা বশতঃ ধারণাপথে উদিত হইল না। লোক গঞ্জনায় এবং নিয়মের ব্যতিক্রম বশতঃ তৎকালে তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তিনি শারীরিক ক্লেশ হইতে বিশ্রাম পাওয়ার মানসে পুনঃ পুনঃ সমাধি ভাবে বিভোর থাকিতেন—ইহাতে শরীর আরো দুর্ব্বল ও রক্তবিহীন হইল তাহার শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হইল চলৎশক্তি রহিত হইল। তাহার প্রিয় ভক্ত রসিক তৎকালে কলিকাতা নগরীতে অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিল। তখন মায়ের মনোভাব নীচে নামাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে ঘন ঘন সমাধি-ভাবে শরীরের দুর্ব্বলতা ও মানসিক উদাসীন্য বৃদ্ধি না পায় সেজন্য মায়ের নিকট রসিকের উপস্থিত

থাকার প্রয়োজনীয়তা অপরাপর ভক্তগণ অনুভব করিল। মুক্ত পুরুষদের মন সমাধি-ভাবে ইহ জগতের বিলীনতায় অপূর্ব্ব আনন্দে বিরাজ করে। "কিমপি কিমপি সতত বোধং কেবলানন্দরূপং—নিরবধি গগনাভং নিষ্কলঙ্কং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞ পূর্ণং সমাধৌ।" শঙ্কর বিরচিত বিবেক চূড়ামণি সুতরাং সেই অপূর্ব্ব আনন্দ-ধারায় নিমজ্জিত মন-কলিকে ইহ জগতের ভাবে টানিয়া আনার পক্ষে কেবল মাত্র উপায় এই যে মুক্তাত্মার মনে যে ভাবের প্রাধান্য বিরাজ করে তাহার পরিপোষক কার্য্য বিধান করা। এই বিবেচনা মত কলিকাতায় রসিককে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ তার করিয়া জানান হইল। এই সংবাদ পাইয়া রসিক অধীর মনে বি, এ, পরীক্ষার প্রাক্কালে কুমিল্লা নগরীতে মায়ের পদ প্রান্তে সমবেত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ মা অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন ঃ তাঁহার অসুখের বাহ্যিক চিকিৎসা করার প্রয়োজন হইল না। লোকোত্তর মানবের চিকিৎসা মনের অনুকূলতা সম্পাদনে সহজে আরোগ্যান্মুখ হয়। প্রিয় ভক্তগণের সহচারিতায় তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য এতাদৃশ বিকল হইল যে তিনি এই অসুখের পরে পরজীবনে পূর্ব্ববৎ পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়াই মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ আরব্ধ জাগতিক কার্য্যসমূহ পরিচালিত করিয়াছিলেন। তখন তিনি সুস্থতা লাভের সঙ্গে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন "এই সময় জীবন-রক্ষা পাওয়ার হেতু ছিল না;

কেবল ভক্তগণের অনুরাগ এবং ভক্তগণের প্রতি ভালবাসা জীবন রক্ষার হেতু হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ মা তৎসময়ে কতক সুস্থ হওয়ার পরই কলিকাতা যাওয়ার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ভক্তগণ তদবধি বুঝিতে পারিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞ মা ভক্তগণের সাহায্য ব্যতীত জীবন-রক্ষার প্রয়োজনীতা দেখেন না—তিনি চাহিতেছেন ভক্তহৃদয়ের অনুরাগ—ইহার বিনিময় ব্যতীত তিনি দেহ ধারণের আবশ্যকতা বোধ করেন না। তখন উপস্থিত ভক্তগণের ক্ষীণ চেষ্টার বলে ব্রহ্মজ্ঞ মাকে কলিকাতা মহানগরীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা হইল এবং সেখানে একটা নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ভাড়া করিয়া মায়ের অবস্থানের ব্যবস্থা হইল এবং যথা সময়ে রসিক ও অতুল সহ ব্রহ্মজ্ঞ মা কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিলেন।

তৎসময়ে ব্রহ্মজ্ঞ মা কলিকাতা নগরীতে সিদ্ধেশ্বর লেনস্থ এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তদীয় প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে বসতি করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়াতে তিনি পরম পরিতোষ বোধ করিলেন। তিনি প্রিয় ভক্তগণের সঙ্গে বসতি করিয়া তাহাদের নির্ম্মল চিত্তে ধর্ম্ম-ভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি যে অভিপ্রায় খুঁজিয়া চলিতেছিলেন সেই ঈপ্সিত কার্য্যের কতক সফলতা দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মনের লুক্কায়িত ভাব রহস্য ক্রমশঃ ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইল। তৎকালে প্রিয়ভক্ত রসিক, অতুল, গিরিশ, প্রফুল্ল, হরিকমল,

অনঙ্গ প্রভৃতি ভক্তগণ সহ মায়ের আনন্দাভিনয় এক স্মরণীয় বস্তু। প্রিয় ভক্তেরা মায়ের শরীর সুস্থ রাখার প্রচেষ্টা যথাসাধ্য করিতেছিল কিন্তু মা ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া ভক্ত-হৃদয় বিনোদনে দিনাতিপাত করিলেও রোগ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। তখন মায়ের পরিচর্য্যার ভার ছিল রসিক ও গিরিশের উপর এবং অন্যান্য ভক্তেরা সকাল ও বিকালে সমবেত হইয়া মায়ের সেবা যত্নের বিহিত করিতে সাহায্য করিত এবং মায়ের সুমধুর তত্ত্ব-কথা আলোচনা ও শ্রবণে হৃদয়ের মলিনতা ও অন্ধকার বিদূরিত করিবার সুযোগ লইত। বিকাল বেলায় কখন কখন ভক্তবৃন্দ চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া উপবেশন করিত এবং ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া মানব জীবনের মূল রহস্য, মৃত্যু-রহস্য, বিষয়-বৈরাগ্য, ভক্ত বিচার প্রভৃতি তত্ত্বকথার অবতারণা ক্রমে ভক্তদের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরস বিতরণ করিতেন। তখন সেই তত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রেমের অভিনয়, ও প্রেমাধিকারের প্রতিযোগিতা এবং মায়ের সমাধি ভাব দর্শন অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক. হইত। মা ভক্তগণকে ভালবাসিয়া তাহাদের প্রাণে অধ্যাত্ম বীজ বপন করিয়া পরিতোষ অনুভব করিতেন এবং এক এক ভক্তকে এক এক ভাবে নিজ সহযোগী পন্থার পরিচালনা করিতেন। তখন ভক্তেরা মায়ের ভালবাসার প্রতিযোগিতা করিয়া মাকে উত্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না—প্রকারান্তরে ইহা মায়ের স্বাস্থ্য নষ্টের কারণ হইয়া পড়িত। ভক্তদের আবদার রক্ষার জন্য মায়ের মনে ও শরীরে যে গ্লানি উপস্থিত হইত তাহাতে তাহার স্বাস্থ্য হানির

কারণ জন্মিত। সাধু মহাত্মাদের দেহ পবিত্র ও মন উদাস থাকে। কোন কাজে প্রধাবিত মন লইয়া সাধু মহাত্মারা যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন সম্পর্কীয়দেহ যত্ন তদীয় ভক্তদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। ভক্তেরা পরিচর্য্যার ত্রুটি করিলে, নিয়মাদির ব্যতিক্রমে অযথা লোক ছুঁৎ স্পর্শে দৃষ্টি না রাখিলে সাধু মহাত্মাদের দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বাপর যথোচিত যত্ন ও সেবার ত্রুটিতে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের জীবনে স্বাস্থ্য হানির ব্যাপারে তাহাই ঘটিয়াছিল।

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অপূর্ব্ব জীবনের কথা ও অলৌকিক সাধনার কথা শ্রবণ করিয়া আনঙ্গ মোহন বসু মায়ের পদ প্রান্তে আসিয়া সমবেত হইল। অনঙ্গ মালদহ জেলায় শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিল। তখন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রসিকের নিকট মায়ের কথা জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা আসিয়া মাকে দর্শন করিল এবং মায়ের অপূর্ব্ব ভাব মহিমা দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার পদে আশ্রয় লইল। তৎসময়ে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের প্রতি তাহার অনুরাগ এবং সেবা যত্নের জন্য উৎসাহ ও উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সেবা যত্নের ত্রুটি দেখিতে পাইয়া আনঙ্গ তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থায় মন দিল এবং মায়ের দৈনান্দিন জীবনের কার্য্যাবলী সংশোধনক্রমে মায়ের সেবার সুবন্দোবস্ত করার প্রয়াস করিল। তদবধি কয়েকটী নিয়ম ধারার সহযোগে ভক্তেরা মায়ের সহিত চলিতে বাধ্য হইল :— (১) মায়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপিত হউক বা না হউক

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মায়ের আহারও নিদ্রার ব্যবস্থার প্রয়াস করা হইল (২) ভক্তেরা অনেক সময় মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া ঘণ্টা কতক বসিয়া মায়ের গ্লানি উপস্থিত করিত এবং ইহাতে যে মায়ের শরীর রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহা লক্ষ্য করিত না— মাকে এইভাবে গঞ্জনা দেওয়ার পথে ভক্তদিগকে বাধা দেওয়া হইল (৩) ভক্তদের জন্য উপদেশ শ্রবণ ও মায়ের দর্শন পাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারণ করা হইল। এই সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠার পর মায়ের বাহ্যিক উদ্বেগ কতক পরিমাণে প্রশমিত হইল বটে কিন্তু কলিকাতার তৎকালীন গরম হাওয়া ক্রমশঃ মায়ের রুগ্ন স্বাস্থ্যকে অধিকতর রুগ্ন করিল। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দেহে গ্লানি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে পুরীধাম লইয়া যাওয়ার জন্য পরামর্শ হইল। পুরীধামে ব্রহ্মজ্ঞ মাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে নেওয়ার জন্যে অনঙ্গ অধিকতর উদ্যোগী হইল। দেখিতে না দেখিতে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সিদ্ধেশ্বর লেনস্থ বাড়ীতে বস-বাসের দীর্ঘ চারিমাস অতীত হইতে চলিল। রসিকের বি,এ, পরীক্ষার দেওয়া শেষ হওয়ার পর মাএর পুরী যাওয়ার সকল চেষ্টা লাগিল। অনঙ্গ প্রথমতঃ পুরীতে যাইয়া সমুদ্র-পারে একটী বাড়ী অনুকূল হাওয়ার মধ্যে ঠিক করিল। তখন বৈশাখ মাস (১৩২১ বাংলা) ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শরীর দুর্ব্বল ছিল; এই সুদীর্ঘপথে তাহাকে পুরীধামে লইয়া যাওয়া বড়ই চিন্তনীয় ব্যাপার হইল। তথাপি মায়ের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ার পর, একদিন রসিক, হরিকমল, অতুল, অনঙ্গ প্রভৃতি ভক্তেরা মাকে পুরী লইয়া

যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল ; ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ও গাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ার পথে মা শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মুহুর্মুহু সমাধি ভাব পাইতেছিলেন এবং পুরীধামে পৌছিবার পর তাহার শরীর এতাদৃশ কাতর হইয়াছিল যে তিনি একাধারে দশ বারো ঘণ্টা সমাধিভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছিলেন। ভক্তদের নিরাশ প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞ মা সমাধি ব্যুত্থিত হইয়া আশার সঞ্চার করিলেন এবং সমুদ্র পারে উন্মুক্ত স্থানে বাসা বাড়ীর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া বড় প্রফুল্ল অনুভব করিলেন।

পুরীধামে সমুদ্রতটে অবস্থিত দৃশ্য অতিশয় মনোরম। এই স্থানের বাতাস স্নিগ্ধ এবং কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত জনের পক্ষে অতীব শান্তিপ্রদ অনুভূত হইল। তথাকার বিশাল সমুদ্রের দৃশ্য এবং কলিকাতার উত্তপ্ত হাওয়ার জ্বালা জুড়ানো মৃদু মন্দ পবন শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মায়ের ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রসাধান ঘটাইল। ব্রহ্মজ্ঞ মা এখানে পৌঁছিয়াই শীতল বায়ুতে শরীরের জ্বালা জুড়াইবার অবসর পাইয়া এখানে আসার প্রধান উদ্যোগী ভক্ত অনঙ্গকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। সমুদ্রতটে যেখানে মায়ের বসবাসের জন্য বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তাহা খুবই নির্জ্জন ও কোলাহল বিহীন ছিল। এখানে মনের অনুকুল স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে বাস করিবার সুযোগ পাইয়া এবং ভক্তহৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা পাইয়া বড়ই তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনায় সেইখানে এক আনন্দ নিকেতনে পরিণত হইল।

কিন্তু এই আনন্দ ধারার মধ্যে আনন্দের অন্তরায় হইল মায়ের ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং তথাকথিত ভক্তদের হৃদয়-ক্ষেত্রের অনুর্ব্বরতা ব্রহ্মজ্ঞ মা চাহিতেন ভক্তদের প্রাণে যাহাতে বিষয়-বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায়, সত্যাতত্ত্ব ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে এবং তাহাদের চিত্তে যেন মায়া মোহ জনিত পঙ্কিলতা না জন্মে। এই জাগতিক ব্যাপার কল্পনা মূলক—সত্যবিহীন; ইহাকে নিত্য ও সত্য বলিয়া ধারণা করার বাতুল চেষ্টাই অজ্ঞানতা—সমস্ত দুঃখের মূল। অজ্ঞানতা পরিহার পূর্ব্বক নিত্য আনন্দময় আত্মার সন্ধান করা একমাত্র শান্তি ও সুখের কারণ। ব্রহ্মজ্ঞ মা নিয়তই ভক্তগণের মনে আধ্যাত্মিক কথা জাগরিত রাখার সর্ব্বাধিক চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ভক্তগণ মায়ের অসীম প্রেম বারিতে স্নাত হইয়াও অভ্যস্ত জীবনের সংস্কার ভুলিতে পারিতেছিল না। মা একদিন প্রিয়ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমি ভাবিতাম যাহারা বয়োবৃদ্ধ হইয়া সংসারে পরিপক্ক হইয়া নিমজ্জিত রহিয়াছে এবং যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কম তাহারা আত্ম-চিন্তার সূত্র বুঝিতে অক্ষম কিন্তু এখন দেখিতেছি তোমাদের মত যুবকবৃন্দের প্রাণেও এত বহু বাসনা ও এত অন্ধত্ব রহিয়াছে যে ধর্ম্মকথার রস তাহাতে প্রবিষ্ট হইতেছে না।" সৎ বাসনাই হউক অথবা অসৎ বাসনাই হউক, বাসনাজাল ছিন্ন না হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, স্থির ও নির্ম্মল হয় না—হইলে বাসনালুব্ধ অস্থির মনে আত্মার উপলব্ধি হয় না। এই জন্য আমাদের মন হইতে বিচার ও বৈরাগ্য বলে বাসনার উচ্ছেদ যাহাতে হইতে

পারে তদনুরূপ ভাবে আমাদের চিত্তকে গঠন করার জন্য মা সতত উপদেশ দিতে লাগিলেন। মানব জীবনে একমাত্র কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-সাধন, আত্মার উন্নতি বিধান এবং মুক্তি তত্ত্ব উপলব্ধি করা। অন্য কর্ত্তব্য যাহা কিছু রহিয়াছে তৎসকলই অজ্ঞানতার ফল —আত্ম চিন্তাই প্রধান কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞ মা দুই মাসের অধিক কাল, এইভাবে ভক্তহৃদয় বিনোদনে আত্ম প্রসাদ অনুভব করিয়া পুরীতে অবস্থান করেন। তখন আষাঢ় মাস—পুরীর বিখ্যাত রথ যাত্রার উৎসব উপস্থিত হইল। দেশ বিদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই সময় জগন্নাথ দর্শনে এখানে সমাগত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ মা তখন একপ্রকার রুগ্ন—তাহার পিতৃদেব অভয়া চরণ চক্রবর্ত্তী স্বগ্রাম "বিতারা" হইতে পুরীতে পৌছিয়া ভক্তগণ সহযোগে নিজ কন্যার নিকট কয়েকদিন বসতি করেন এবং রথ-যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মা কোথায় বসতি করিবেন কোথায় বাস করিলে তাহার স্বাস্থ্য ও মনের স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুন্ন থাকিবে এই বিষয় লইয়া ভক্তগণ সমবেত ভাবে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। নির্জ্জনতার দিক দিয়া পুরীধাম বসতির পক্ষে ভাল বিবেচিত হইলেও ভক্তগণের শক্তি ও সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মাকে কলিকাতা নগরীতে লইয়া যাইয়া সেখানে স্থায়ীভাবে রাখার মন্তব্যই ঠিক হইল। তখন কলিকাতা নগরীতে পৌঁছিয়া মায়ের সেবাকার্য্যের জন্য মায়ের প্রিয় ভক্ত রসিক মায়ের নিকট থাকিবে এবং অর্থানুকুল্যের জন্য অতুল, হরিকমল ও অনঙ্গ স্বেচ্ছা

প্রণোদিত হইয়া কার্য্য গ্রহণ ও অর্থাগমের ভার লইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। তখন আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে ব্রহ্মজ্ঞ মা পুরীধাম হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন।

কলিকাতা পৌঁছিবার পর পছন্দমত বাসবাড়ী ঠিক করার পক্ষে অনেক অন্তরায় ঘটিয়াছিল এবং ইহাতে মায়ের বসতির অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ মাণিকতলার বাড়িতে মাসাবধি বাস করা হইয়াছিল এবং তৎপরে অখিল মিস্ত্রির লেনে খোলা জায়গায় একটী বাসা-বাড়ী ঠিক করিয়া তথায় মায়ের বসতি করার জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজন করা হইল। তখন মায়ের সেবা কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে হরিকমল ও অতুল বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হইল এবং তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থে মায়ের সেবা কার্য্য চলিতেছিল।

এই সময় ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে বস-বাস কালে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তসমাগম হইত এবং কলিকাতাস্থ অন্যান্য ভক্ত ধীরেন্দ্র, হরিপ্রসাদ, রমেশ, হেমেন্দ্র ডাক্তার প্রভৃতি ভক্ত আসিয়া মাকে দর্শন করিত ও তাহার অমূল্য উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইত। ভক্তগণের বন্ধু বান্ধব কেহ কেহ আসিয়া মাকে দর্শন করিত এবং তাহাদের কেহ কেহ মায়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভক্তগণের সহযোগে চলিত। ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রতিনিয়ত প্রিয় ভক্তগণের বিষয় ভাবিয়া, সকালে বিকালে ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপস্থিত জনগণকে পরিতৃপ্তি দান করিয়া দিনাতিপাত করিতে

ছিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল অপনীত হইল। শরৎকালের সমাগমে শাররদীয় দুর্গোৎসবের ছুটিতে প্রবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অধীর হইল। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মা রসিকের একবার স্বগৃহে যাইবার জন্য অনুমোদন করিলেন—রসিক বৎসরাবধি দেশে যায় নাই। তাহার মনোভাব অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা রসিককে স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি দিলে ও তাহার মন নিরাশ্রয় ভাবে ঘন ঘন সমাধিভাবে ডুবিয়া থাকিতে লাগিল। তখন উপস্থিত ভক্তেরা রসিককে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তার করিয়া সংবাদ পাঠাইল এবং রসিক স্বগৃহে দুইদিন অবস্থানের পরই কলিকাতা আসিয়া মায়ের পদপ্রান্তে সমবেত হইল। তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মনে প্রিয় ভক্তগণের জন্য যেরূপ মায়া ও ভালবাসা পরিদৃষ্ট হইত তাহা সংসার ক্ষেত্রে ও বিরল। তিনি নিজেই লীলা করিয়া এবং নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য করিতেন এবং অন্যান্য লোক সহযোগে রহস্য করিতেন। কখন তিনি কোন ভক্তের বিষয় প্রসঙ্গ উঠাইয়া আলোচনা ও আলাপে কাঁদিয়া ফেলিতেন—কখন কাহার অসুখ হইতে পারে ভাবিয়া অধীর হইতেন ” কখন কখন রসিক বাহিরে গেলে সে ফিরিয়া না আশা পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সময় কাটাইতেন—যখন তাহার এইরূপ ভাব উপস্থিত হইত তখন তিনি কাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না—পরে নিজেই নিজ মনের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন যতদিন তাহার মন এইভাবে বিচরণ করিবে ততদিন তাহার মনের এরূপ চঞ্চলতা পরিদৃষ্ট হইবেই—কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানময় ছিল বলিয়া

তিনি এরূপ সাময়িক খেলায় গা ভাসাইয়া চলিতে কোন বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন মনে করেন নাই। কি অপূর্ব্ব রহস্য! ব্রহ্মজ্ঞ মা বলিতেন আমি—"তোমাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া খেলিতেছি; আমি একপ্রকার সংসারী সংসারক্ষেত্রে মানুষ ভোগবাসনায় মত্ত হইয়া খেলা করে এবং আমি তোমাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া ধর্ম্ম-ভাব লইয়া খেলা করিতেছি—আমার এই যে প্রেম বন্ধন ইহা আমার পক্ষে বন্ধন কিন্তু তোমাদের কল্যাণের হেতু। তবে আমার এই বন্ধন নিজ ইচ্ছাকৃত; সত্যতত্ত্ব আমার পরিজ্ঞাত বলিয়া এই বন্ধনে আমার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা নাই, বিপদ্ নাই—ইহাও একপ্রকার বন্ধন বটে।" কি প্রেম মাধুরী! কি অঘটনঘট—পটিয়সী মায়ার আভাস! এই সকল ভাবিলে আমরা কোন সমাধান পাই না। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি একটী মুক্ত জীবনের অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য—শুনিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের অদ্ভুত জীবনের সাধনার কথা, বিচার প্রবল মন ও তাঁহার অপূর্ব্ব উপলব্ধির কথা—সমাধি রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। আবার দেখিয়াছি ভক্তগণের জন্য তাহার প্রেমাকর্ষণ তৎসঙ্গে তাহার স্বাধীন গতি—উদাসীন চলতি। যখনই কোন ভক্তের প্রতি তাহার সহজ ভাবের ক্ষীণ ধারা উপস্থিত দেখা গিয়াছে তখন তিনি সেই রসে মন গলিয়া লীলা-রহস্য করিতেন এবং আবার কিছুকাল গত হইলে তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া বিচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এইভাবে অনুপ্রেরণায় ভবভূতি লিখিয়াছেন —

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কমলাদপি।
লোকোত্তরানাং চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতুমর্হসি ॥"

লোকোত্তর মহাত্মাদের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠিন এবং কমল হইতেও কোমল—তাহাদের চিত্তের গঠন কে বুঝিতে পারে? ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রিয় ভক্তগণের সঙ্গে জড়িত হইয়া কতই না মধুর লীলা খেলা করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিজ সন্তানের মত ব্যবহার করিয়াছেন—আবার কোন কোন ভক্তের প্রতি ব্যতীক্রম ব্যবহারে অন্যান্যের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। মায়ের যেমন শিশু সন্তানের প্রতি সমধিক স্নেহ মমতা দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ মা সন্তান সদৃশ স্নেহ ও ভালবাসার ভাবে ভক্তগণের সহযোগে দিন কর্ত্তন করিবার সময় কোন কোন ভক্তকে সমাধিক স্নেহে নিজ সকাশে ও আবদারে চালিত করিতেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মা রসিককে নিজের নিকটে রাখিয়া নিজ পরিচর্য্যার ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া চলিতেন—রসিক স্থানান্তরে গেলে তিনি ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেন; যেন ছোট শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে মা উদ্বিগ্ন থাকেন। প্রিয় ভক্তগণ সহযোগে ব্রহ্মজ্ঞ মা দিনাতিপাত করিতেছিলেন। শীত ঋতুর কতিপয় দিবস দেখিতে না দেখিতে ফুরাইয়া গেল। গ্রীষ্মের ঋতুর আভাস অনুভূত হইতেছিল—কলিকাতা নগরীতে গরম আব-হাওয়া চির বিদ্যমান—তাহাতে গ্রীষ্মঋতুর সমাবেশে গরমানুভূতি ঘনীভূত হইতেছিল। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের রুগ্ন ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়া কলিকাতা অবস্থান করা কষ্টকর হইয়া উঠিল এবং মায়ের

শারীরিক উদ্বেগ বিবেচনা করিয়া ভক্ত অনঙ্গ মোহন দার্জ্জিলিং জেলার কার্শিয়াং নগরীতে মায়ের বসবাসের জন্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়া তথায় এক বাড়ী ভাড়া করিয়া লইল। বায়ু-পরিবর্ত্তনে ও নিজ্জর্ন স্থানে বস-বাস করিলে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও আনুসঙ্গিক দেহ পীড়া প্রশমিত হইবে মনে করিয়া ভক্তগণ তাহাদের ক্ষুদ্রশক্তির সহায়তায় মাকে কার্শিয়াং নেওয়ার বন্দোবস্ত করিল। তখন ১৩২১ বাংলা সনের চৈত্র মাসের প্রথম ভাগেই ভক্ত রসিক ও গিরিশ মাকে লইয়া কলিকাতা হইতে কার্শিয়াং যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মায়ের রুগ্ন শরীরের যথোচিত যত্ন নেওয়ার জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল—তথাপি লোক গঞ্জনায় মা পথ ভ্রমণের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু কার্শিয়াং নগরীতে পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে শিলিগুরি ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই মা তথাকার শীতল আবহাওয়াতে মনের প্রফুল্লতা অনুভব করিলেন এবং দূর হইতে হিমালয়ের সুগভীর দৃশ্য মায়ের অগাধ হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল এবং তিনি সমাধি-রসে মুহুর্মুহু নিমগ্ন হইবার অভিলাষী হইলেন—তখন ভক্ত রসিকের আহ্বানে ও প্রচেষ্টায় মায়ের মন নিম্ন-স্তরে বিচরণ করিতে বাধ্য হইত। শিলিগুরি ষ্টেশন হইতে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে হিমালয়ের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উচ্চ স্থানে আরোহণের দৃশ্য ও পার্ব্বত্য শোভারাশির পরিদর্শন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা কার্শিয়াং নগরীতে পৌঁছিলেন এবং তথাকার

অনুকূল হাওয়া ও নির্জ্জন গিরিগুহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মায়ের মনের স্বচ্ছন্দতা আনিয়া দিল। মা সেখানে প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে স্বাধীন ভাবে উন্মুক্ত আকাশ বক্ষে স্থিত পর্ব্বতরাজির মধ্যে বসতি করিবার সুযোগ পাইয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং পূর্ব্ব সময়ে অত্যুচ্চ গিরিমালা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষীণ অভিলাষের পরিতৃপ্তি হৃদয়ে অনুভব করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ-মা ঐস্থানে একাধিক্রমে ছয় মাস কাল অবস্থিতি করিলেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে লীলাখেলা ভক্তদের প্রাণে নব নব ভাবের প্রেরণা জাগাইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের প্রাণের উচ্ছাসিত ভাবধারা ভক্তহৃদয়ে নূতন উৎস সৃজন করিল এবং মা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া সুগভীর তত্ত্ব কথায় ও সাধন প্রণালীর নিগূঢ় মর্ম্ম-বাণী শ্রবণ করাইয়া ভক্তদিগকে নব ভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তখন মায়ের দৈনন্দিন কার্য্য প্রণালী স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হইত। মা স্বভাবগত অভ্যাসের ফলে রাত্রিবেলায় স্বল্প নিদ্রা ভোগান্তে প্রাতঃকালে অধিক বেলায় নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং ভোর কৃত্য সমাপনান্তে পার্ব্বত্য প্রদেশের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিদর্শন মানসে পদব্রজে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন; মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইলে পর মা ভক্তগণ লইয়া তত্ত্বকথার প্রসঙ্গে মহানন্দে সময় কর্ত্তন করিতেন। অবসর বিনোদন সময়ে স্বীয় কোঠরে ও শয্যায় উপবিষ্ট থাকিয়া গবাক্ষদ্বারে হিমালয়ের সুদূর প্রসারী দৃশ্যাবলী ও তুষারাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গ মালার ধবল দৃশ্য অবলোকন করিয়া পরম তৃপ্ত হইতেন এবং

জীবনের প্রাক্কালে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা ও মহাসাগর দর্শনের অভিলাষের পরিতৃপ্তি সমাহিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণের সমক্ষে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া পরম কৌতুহল অনুভব করিতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং কখন কখন রাত্রির পূর্ব্বভাগে ভক্তগণের সহযোগে তিনি নানাবিধ কথার উল্লেখ করিতেন এবং ভক্তগণের নিকট হইতে বহুকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার হাস্য-পরিহাসের প্রসঙ্গ ও সুমধুর তত্ত্বভাবে জড়িত ছিল। গ্রীষ্ম-ঋতুর দারুণ উত্তাপ সেখানে মায়ের দেহকে পীড়া দিবার সুযোগ পাইল না। মা সেখানের জল-বায়ুতে দেহের স্বচ্ছন্দতা পাইয়াছিলেন—রোগযাতনার কতক উপশম হইয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশে হরিকমল, প্রফুল্ল প্রভৃতি ভক্তেরা মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হইল—কিন্তু গিরিশ পারিবারিক দুঃখ জ্বালায় জড়িত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল—যামিনী (চক্রবর্ত্তী) তখন মায়ের সেবাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে কার্সিয়াং সহরে আসিয়া পৌঁছিল।

ক্রমশঃ বর্ষাকাল (১৩২২) আসিয়া সমুদিত হইল। তখন আষাঢ় মাসে মেঘ-বারির রসাস্বাদনে পার্ব্বত্য বনরাজি পরিপুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ ও সবুজ শোভায় রঞ্জিত হইল। যে দিকেই নিরীক্ষণ করা যায় সে দিকেই অচলায়তনের গাম্ভীর্য্য অনুভূত হইত। মহাসমুদ্রের অসীম আভাসের সঙ্গে একটা চঞ্চলভাব অনুভূত হয় কিন্তু পর্ব্বত রাজ্যের বিশাল বক্ষের গভীর শোভায় অনন্তের স্থির-মাধুরী উপলব্ধি করা যায়। শ্রীগুরু-মা বলিতেন

পর্ব্বতরাজির বিশাল নিস্তব্ধতায় সমাধির রস অনুভূত হয় এবং সমাধির গভীরত্ব, পার্থিব বস্তুনিচয়ের মধ্যে সু মহান্ পর্ব্বত মালায় সমধিক পরিব্যক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ-মা গভীর অরণ্য-সমাকুল হিমালয়ের উচ্চ শৈল শৃঙ্গে বসতি করিয়া নিজ মনের অনুকূল ভাবে নিমজ্জিত থাকিয়া দিন কাটাইতেছিলেন—তিনি স্বভাবগত ভাবেই "রহসি অবস্থিতি" ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রিয় ভক্তগণের প্রতি তাঁহার যেই প্রেমাকর্ষণ তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছিল তাহার পরিপোষকতার প্রকৃষ্ট স্থান পাইয়া তিনি কয়েক মাস স্বচ্ছন্দ মনে বিহার করিলেন। তৎকালে তিনি নিজের জীবনের পূর্ব্ব-কথা ভক্তদের নিকট প্রকাশ করিতেন, তত্ত্ব-কথা, সাধন-কথা ও উপদেশের ভিতর স্বকীয় জীবনের কথা বলার অভিপ্রায় দেখিয়া ভক্তেরা গুরু মাকে বহু প্রশ্ন করিবার ও উত্তর শুনিবার সুযোগ পাইল। এই সময় তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া জীবনের অনেক কথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং ভক্তদের পরিতোষ সাধনের জন্য "ষড়-চক্র" নামক সাধন কথা রসিকের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই "ষড় চক্র কথা" সাধন জীবনের এক অমূল্য সম্পত্তি। জ্ঞান বিচার প্রণালীতে তান্ত্রিক ও যৌগিক কথা এমন সহজ ও সুন্দর ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে এইরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই "ষড়-চক্র" ব্যাখ্যায় আছে সাধকের মানসিক গতির ক্রমোন্নতির অবস্থার কথা এবং সেই অবস্থার তত্ত্ব-গত তাৎপর্য্য। জীবের মন মায়িক জগতে, মায়িক ও

জাগতিক সুখে দুঃখে নিমগ্ন থাকায় সময়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে তত্ত্ব-জগতে বিচরণ করিবার প্রয়াসী হইলে, গুরুর উপদেশে ও দীক্ষার সহায়তায় সাধন-জগতে তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সময়ে কি এবং কিরূপ অবস্থাদির পর্য্যায় আসিয়া সমুদিত হয় তাহাই বিশদ ব্যাখ্যাকারে "ষড়্‌চক্র" কথায় উক্ত হইয়াছে। এই জগৎ এবং জীবের জগৎ-রচনার মূলদেশে রহিয়াছে মন; কিন্তু মন ও কল্পনামূলক উহা আত্মার তরঙ্গ মাত্র। মন কল্পনামূলক বলিয়া সত্যবস্তু নহে এবং মনই জীবের জীবন-নাটকের মূল সূত্র। সুতরাং মনের গঠনের তারতম্যানুসারে সাধকের সাধনানুভূতি এবং সত্য উপলব্ধির ধারা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য সাধন প্রণালীতে একই স্থির প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। এই জন্যই এই জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্ভব এবং বিভিন্ন প্রণালীতে উপাসনার রীতি বিহিত হইয়াছে। সাধকের মনের গঠনের তারতম্যানুসারে এবং জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যতিক্রম অনুসারে সাধন পথ বিভিন্ন হইলেও, ধর্ম্ম সাধনার পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও সনাতন সত্য এক শাশ্বত ও অদ্বয় এবং সেই কারণে সাধন পথ বিভিন্ন হইলেও তাহার অনুভূতির প্রণালীর ভিতর মূল ভাবের ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ মা "ষড় চক্র" কথার অবতারণার প্রসঙ্গে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে মনের ক্রমানুগতিই সাধনার মূলদেশে বিদ্যমান। সাধারণ জীবের মন প্রকৃতির রসে ভোগসুখে নিমগ্ন থাকে। জ্ঞান-বলে মন আত্ম-রসাস্বাদনে প্রয়াসী হইলে যখন

বিষয়-রস পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্থ ভাবে প্রসাধনে প্রচেষ্ট হয় তখন মনের বাহ্যিক বিষয়-রসে ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য প্রথম লক্ষণাকারে পরিলক্ষিত হয় তখন মনের তত্ত্ব-কথা শ্রবণে ও মননে চেষ্টা জন্মে এবং ক্রমশঃ উচ্চগতির সঙ্গে আত্মার আলোক পাত অনুভব করে—নিজেকে বিশাল ভাবে হৃদয়ে অনুভব করে—দূর দর্শন এবং দূর শ্রবণে শক্তি আহরণ করে—ইষ্ট প্রেমে মগ্ন হইয়া আত্মস্থভাবে বিচরণ করে এবং প্রেররসের ক্রীড়া-কৌতুক অনুভব করে. নিত্য রসের পরিতৃপ্তিতে মাজিয়া সমাধির উচ্চ হইতে উচ্চ সীমায় পৌঁছিতে থাকে এবং নিত্য-সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে—তখন মন হইতে জগৎ-কল্পনা, জাগতিক ভাবরাশি বিদূরিত হয় এবং মন ব্রহ্ম-রসে ডুবিয়া পড়ে—মনে বিষয় চিন্তা স্থান পায় না—আত্মার "আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি ভাবে সাধকের মন নিবিষ্ট হইয়া সাধক জীবনমুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শ্রীমুখ বিনিঃসৃত বাক্যাবলী সংযোগে তাহার প্রিয় শিষ্য রসিক 'ষড়-চক্র" নামে তত্ত্ব কথার এক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া রাখিল।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা তত্ত্বোপদেশ ও বিচার-বৈরাগ্যের কথার সহযোগে ভক্তদিগকে আত্ম-চিন্তা করিতে এবং ধ্যান পরায়ণ হইতে উপদেশ দিতেন। ভক্তেরা তদবধি একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ধ্যান অভ্যাস করিতে লাগিল। তখন হিমাচল-বাসে সাধনার প্রকৃষ্ট নির্জ্জনতা ও নীরবতার ভিতরে ভক্ত রসিক, হরিকমল, গিরিশ, প্রফুল্ল স্বীয় প্রকোষ্ঠে ধ্যান অভ্যাস করিত। যখন ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বীয় মনের বিনোদনার্থ গল্প ও হাস্য পরিহাস

করিতেন তখন ভক্তেরা সুযোগ বুঝিয়া মাকে বহু কথা জিজ্ঞাসা করিত এবং তদীয় অপূর্ব্ব জীবন-কথার রহস্য জানিতে উৎকণ্ঠিত হইত। একদিন ভক্ত রসিক মাকে তদীয় জীবনের রহস্যময় সর্পদংশনের কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল। তদুত্তরে ব্রহ্মজ্ঞ মা জ্ঞাপন করিলেন "আমার জীবনের রহস্য জানিবার ও উপলব্ধি করার শক্তি কাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। আমার জীবনটা কেমন জান? মনে কর যেন একটী লোককে একটী বাক্সে বদ্ধ করিয়া আনিয়া এক নিবিড় অরণ্য মাঝে আনিয়া ছাড়িয়া দিল—তখন সে কোন দিশা না পাইয়া যেরূপ ইতস্ততঃ ঘুড়িয়া ফিরে, পথের অনুসন্ধান করে, বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে না—সে স্থান হইতে পলাইয়া যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, আমার জীবনের গতি ও তদ্রুপ ছিল—শিশুকাল হইতেই কোন জিনিষের প্রতি কোন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমার মনের টান ছিল না, আমি বিদেশে পতিত পথিকের মত উদাস মনে দিন যাপন করিতাম। আমার মন কোন ভোগের বস্তুতেই আসক্ত হইত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিভীষিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জগতের অতীত সত্যানুসন্ধানে মন স্বতঃই অনুপ্রাণিত হইত; মনে মৃত্যু চিন্তা প্রবল আকারে খেলা করিত। আমি মৃত্যু-চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া জগতের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া কোন কিছুতেই শান্তি অনুভব করিতাম না। এইরূপে উদাস মনে সত্য কি, নিত্য কি, শান্তি কোথায় মিলে জানিবার জন্য মন অহর্নিশি বিচার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিত; ঈশ্বর উপাসনার কোন স্থির

প্রণালী ও মনে স্থান পাইত না—কেবল শান্তি পাওয়া যায় কিরূপে এই চিন্তায় উদাস মনে বিচরণ করিতাম। তখন আমার নির্লিপ্ত ও একাগ্র মনে চিন্তার ফলেই একটি অদ্ভুত বিষয় ঘটিল। তৎকালে আমি আমার রন্ধন কার্য্য কখন কখন নিজেই করিতাম এবং পাকের পাত্রাদি নিজেই ধৌত করিতাম। আমার উদাস মনে সকল সময় ধারাবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হইত না। তৎকালে একদিন আমি আমার পাকের পাত্র পুকুরের জলে ধৌত করিবার সময় একটি সর্প আমাকে দংশন করিল; তখন সর্প-বিষ নিবারণের জন্য ওঝা-বৈদ্য আনা হইল এবং সেই ওঝা-বৈদ্য সর্পবিষ বাহির করিয়া দিল। কিন্তু সেই ঘটনায় আমার মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল—আমার মনে ভয় না জন্মিলেও সাপ কেন আমাকে দংশন করিল ইত্যাকার একটা আতঙ্ক আমার মনে পরোক্ষ ভাবে ক্রিয়া করিতেছিল। তখন একদিন আমি দেখিলাম যেন সত্যই একটা সাপ আসিতেছে এবং উহা আমাকে দংশন করিতে যাইতেছে—আমি তখন চীৎকার করিলাম এবং চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া পড়িলাম—আমার অজ্ঞাত সারে আমি সর্পদংশনে ঢলিয়া পড়িলাম—সর্পদংশনের আঘাত জনিত আমার গায়ে রক্ত দেখা গেল। কিন্তু কোন সর্প কেহ দেখিল না—তখন ওঝা-বৈদ্য আসিয়া বিষ নামাইল। তৎপরে কিছু দিন আমার ঐরূপ ঘটনার সূত্রপাত হইল—আমি সর্পদংশনের ভয়ে চীৎকার করিলাম—সাপ আসিতেছে, ঐ সাপে আমাকে দংশন করিল এই বলিয়া আমি ঢলিয়া

পড়িতাম—কেহই সর্প দেখিল না, অথচ আমার গায়ে রক্ত-চিহ্ন দেখা যাইত। তখন লোকেরা আমার উদাসীন ও পবিত্র জীবন ধারায় এই ঘটনা হইতে আমাকে দৈব-প্রভাবান্বিত ও মনসা দেবীর বর প্রাপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। এই ভাবে তিন মাস অতীত হইল। আমি এই ঘটনাগুলিকে স্বীয় মনে বিচার করিতে লাগিলাম এবং এই সর্প অন্য লোকে দেখিতে পায় না, কেবল আমি দেখিতেছি কেন ইত্যাকার বিচার আমার মনে উদিত হইল—তখন সেই সর্প দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বিচার ও অনুধাবন বলে বুঝিতে পারিলাম যে সর্প উজ্জ্বলাকারে দৃষ্ট হইতেছিল—ইহারই কারণ কি? তাহা অনুধাবন ও চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলাম যে এই ঘটনা আমার মনের একাগ্র চিন্তা-প্রসূত ব্যতীত আর কিছু নহে। তদবধি এইরূপ সর্পদংশনের রহস্য নিজ মনে ধরা পড়িল এবং আমার কল্পনা গাঢ় হওয়াতে এইরূপ হইতে ছিল ইহা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পূর্ব্ববৎ একাগ্রতার অভাব হওয়াতে ঐরূপ সর্প দংশন ব্যাপার দূরীভূত হইল। কিন্তু আমার মনে তখন একাগ্রতার ফলে উজ্জ্বল আকারে দৃষ্ট বহু কল্পনাই পরীক্ষিত হইল, আমি কল্পনা করিয়া অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তিও দর্শন করিলাম—দিব্য আকারে। তখন আমি স্বীয় মনে হইা দৃঢ় ভাবে বুঝিলাম যে সাধক মনের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে সেই একাগ্রতার ফলেই ইষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনা হইতে আমি সাধনার অনুকূল

নির্জ্জন ঘরে বস-বাস করিবার সুযোগ পাইলাম। তখন লোকেরা আমাকে মনসা সিদ্ধা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিল— সকলে আমাকে সিদ্ধা স্ত্রীইন বলিয়া বলিতেছিল। আমি স্বীয় ভাব গোপন রাখিয়া নির্জ্জন ঘরে বসতি করার সুযোগ লাভ করিয়া এবং ততোধিক নিজ উপলব্ধির বিষয় কেহই বুঝিতে পারিবে না বলিয়া ও নিজ উপলব্ধির বিষয় কাহার নিকট বলা অসমীচিন বোধে নিজ মনে দিনাতিপাত করিতে ছিলাম।” মায়ের শ্রীমুখ হইতে তদীয় মহীয়সী মানসিক শক্তির কথা শুনিয়া আমরা বিস্ময়ে পুলকিত হইলাম। তাহার অপূর্ব্ব মনের শক্তি ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মনের অভাব-নীয় নিস্পৃহতার কথা শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। ব্রহ্মজ্ঞা মা তদীয় জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনা যাহা অন্য কাহাকে বলিবার অবশ্যকতা বোধ করেন নাই তাহা প্রিয় ভক্তগণের নিকট বলিয়া তাহাদের চিত্ত বিনোদন করিতেন। তিনি তাহার দেহ-পীড়ার অনেক কথা বক্ষস্থলে কেনছার (caneer) পীড়ার যাতনা, কি ভাবে তিনি ঐ যাতনা তিন বৎসর কালে নিজ উদাস গতির সহযোগে সহিয়াছেন, সামাজিক গণ্ডালিকা প্রবাহে তাহার উচ্চতম ভাব বুঝিবার কাহার শক্তি না হওয়াতে কোন কোন দুষ্ট লোকের উৎপীড়ন ও সমালোচনা কি ভাবে তিনি সহ্য করিয়া চলিয়াছেন তাহা প্রিয় ভক্তগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়া হাস্য পরিহাস করিতেন; তিনি অসীম শক্তি-ধর হইয়াও সাধারণ লোকের

নিকট ক্ষমতাহীন হইয়া বাহ্যিক আড়ম্বর বিহীন অবস্থায় বিচরণ করিয়াছেন। সমাজে দুর্নীতি-পরায়ণ লোক চালাকি করিয়া ধর্ম্ম-ভাণ দেখাইয়া কি ভাবে চলিতে থাকে এবং সরল পিপাসু সাধক কি ভাবে লোক-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া চলে, সমাজ সরল সাধুর সমাদর করিবে জানে না বরং অযথা নিন্দাবাদ—বহুল সমাজে সরল সাধুর ব্যবহারের প্রতিকূলতা পরিদৃষ্ট হয় এইরূপ বহুকথা ব্রহ্মজ্ঞ-মা নিজ প্রিয় শিষ্যগণের নিকট জ্ঞাপন করিয় সুখ পাইতেন এবং বলিতেন "জীবনের অনেক গুপ্ত-কথা তোমাদের নিকট বলিয়া মনকে পাতল করিলাম।"

এই সময় ব্রহ্মজ্ঞ-মা প্রিয় ভক্তগণের হৃদয়ে তত্ত্বভাব জাগাইবার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করিতেছিলেন। অনেক ভক্তগণের নিকট তত্ত্ব-কথা পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। ভক্তদের জীবনের ধর্ম্মোন্নতি যেন তাহার দায়িত্ব আকারে পরিণত হইল তিনি জীবনে কোন দায়িত্ব নিয়া চলা বা দায়িত্বের অধীনে কোন কাজ করা পছন্দ করিতেন না—কিন্তু ভক্তদের জন্য স্বতঃই দায়িত্ব উদিত হইয়া তাহার মনকে উৎকন্ঠিত করিতেছিল বুঝিতে পারিয়া তিনি সময় সময় আপচোষ পরিজ্ঞাপন করিতেন। এইরূপ মনোগতি নিয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মা প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে ছয়টী মাস হিমালয়ে তুষারাবৃত হিমায়তনে বসতি করিলেন এবং শীতঋতু সমীপবর্ত্তী দেখিয়া ভক্তেরা মাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য চেস্টা করিল।

১৩২২ সনের আশ্বিন মাসে প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে মা

কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ধীরেন্দ্র নাথ সেনের এণ্টনী বাগানস্থ বাসা-বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া কতিপয় দিবস তাহাদের আদর যত্নে সেখানে বাস করেন। ব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার চিরন্তন মনোবৃত্তি নিয়া নির্জ্জনে থাকিয়া ভক্তদের হিত কামনায় দিনাতিপাত করিতে চাহিতেন। তাহার জন্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ একটী খোলা বাড়ী ভাড়া করা হইল। তখন সেখানে মা প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে ছয় মাস কাল অতিবাহিত করেন।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সেবা কার্য্যের জন্য তদীয় প্রিয়ভক্ত রসিক মায়ের নিকট রহিল এবং প্রফুল্ল, স্বর্ণ কমল ও রমেশ প্রভৃতি ভক্তেরা তাহার সহযোগিতা করিত। মা স্বচ্ছন্দমনে ভক্তগণের সহযোগে কতিপয় মাস এখানে বসতি করিলেন। তখন ভক্তগণের বন্ধুরা অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিত এবং তাঁহার অমিয় কথা ও অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। হেমেন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দত্ত, কুমুদ চৌধুরী ও অন্যান্য ভক্তগণের পরিচিত বন্ধুরা মায়ের দর্শন লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বহু-কথার অবতারণা দ্বারা স্বীয় স্বীয় মনোভাবের সন্দেহ নিরসন করিয়া তত্ত্ব-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তৎকালে ধীরেন্দ্র ও হরিপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতায় বসতি করিত এবং সময় সময় মায়ের দর্শন পাইবার জন্য সমবেত হইত। মায়ের জনৈকা প্রিয় ভক্ত সুভাষিনী সেন গুপ্তা মাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিত এবং মায়ের দর্শন পাইতে সময় সময় এখানে আসিত।

মা তাহাকে খবর পাঠাইয়া আনাইয়া কখন কখন দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার সহযোগে পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। মায়ের দর্শন লাভে সমবেত ভক্তগণের মধ্যে হেমেন্দ্র ঘোষ Dr. Ghosh Standard Pharmacy রসিকের বন্ধু হিসাবে মায়ের সেবা কাজের সহায়তা করিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা শারীরিক গ্লানি ও মাথা বেদনার অসুখে প্রায়ই অসুস্থ বোধ করিতেন, তখন মায়ের অসুখ প্রশমনে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে হেমেন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবনায় মাকে চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হইল এবং হেমেন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় বিনা ব্যয়ে মায়ের চক্ষু পরিক্ষীত হইল—তখন হেমেন্দ্র মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তাহার পরিচয়ে মেডিকেল হাসপাতালে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের চক্ষু পরীক্ষা ক্রমে চশমার ব্যবস্থা হইল এবং বটকৃষ্ণ পালের দোকান হইতে চশমা খরিদ করিয়া ব্যবহার করাতে মা মাথা-বেদনার অনেক উপশম বোধ করিলেন।

যে সকল আগন্তুক মাকে দর্শন করিতে আসিত তাহারা নিজ হইতে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজ হইতে সহজে কোন কথা উত্থাপন করিতেন না, তিনি তর্ক বিতর্ক মাত্রও পছন্দ করিতেন না। সরল পিপাসু লোক উপস্থিত দেখিলে তিনি নিজ হইতে উপদেশ প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না সাধারণতঃ লোক সমাগমে তিনি মৌনভাবে থাকিতেন। কাহারও সরলতা না দেখিলে তিনি প্রশ্নোত্তর জ্ঞাপনে স্বকীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেন। কোন বিতর্ক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন

"আমি কিছু জানি না, আমি বুঝি না।" লোকজন সরিয়া পড়িলে আমরা মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে কপটতার চিহ্ন দেখিতে তাহার কথা বলার ইচ্ছা হইত না। আমরা যদি বলিতাম যে ইহাতে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে না তিনি ইহা জানেননা বা বুঝেন না, তখন তিনি বলিতেন যে লোকের এরূপ ধারণা জন্মিলে তাহার কোন ক্ষতি নাই বা এজন্য কোন আপচোষ নাই। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের ছোট খাট কথার ভিতর তাহার স্বভাবোচিত উদাসীন ও স্বাধীন জ্যাতির এবংবিধ অনেক পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি। তিনি ছিলেন সত্যের আধার সত্যকে জানিবার জন্য যাহারা পিপাসু হইত তাহারা তাহার অমৃত উপদেশ পাইয়া কৃথার্থ হইত তাহার যথোচিত ভালবাসার ভাবে মোহিত হইত।

এইভাবে প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে ব্রহ্মজ্ঞ মা কয়েক মাস কলিকাতা অবস্থান করিলেন—তখন ক্রমশ গ্রীষ্ম ঋতু সমুদিত হইল। মা অসুস্থ শরীরে কলিকাতার গরম হাওয়াতে বসতি করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন তদীয় প্রিয় ভক্ত অতুলকে সংবাদ দিয়া কলিকাতা আনা হইল। বহুপ্রকার চেষ্টার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অতুল ও রসিক মাকে নিজ দেশ বিতারা গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য বাধ্য হইল। মাকে পুরীধামে অথবা এবংবিধ স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইবার পরামর্শ উপস্থিত করা হইলে মা তৎসকল প্রত্যাখান করিয়া নিজ গ্রামে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের ইচ্ছা ও আদেশ মানিয়া তাহার প্রিয়

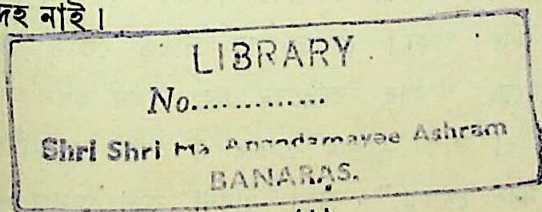
ভক্ত অতুল এবং রসিক ১৩২২ বাং সনের চৈত্র মাসে মাকে কলিকাতা নগরী হইতে নিজদেশে বিতারা গ্রামে লইয়া আসিল। বিতারা গ্রামে পৌঁছিবার পর ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মানসিক গতির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। কঠোর পরিশ্রমের পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত প্রবাসীর মত বিশ্রামের পক্ষপাতী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা বিতারা নিজ ভ্রাতাদের বাড়ীতে একমাত্র প্রিয় ভক্ত রসিককে সঙ্গে রাখিয়া দিনাতিপাত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন ভক্ত অতুল, অনঙ্গ প্রভৃতি মায়ের নিকট কয়েকদিন মাত্র থাকার সুযোগ পাইল এবং সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। মাএর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ শুনিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু পরিচিত লোক মাকে দর্শন করিল।

ব্রহ্মজ্ঞ মা তদবধি কয়েক বৎসর বিতারা গ্রামে নিরিবিলি ভাবে বসতি করেন। তখন তাহার ভক্তগণ সহ লীলা খেলার পর্য্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দুই বৎসর পূর্ব্বে যিনি তীব্র মানসিক চঞ্চলতায় অধীর হইয়া ভক্তগণ সহযোগে তত্ত্ব মদিরা বিতরণে উন্মত্তের মত ছুটিয়াছিলেন, কত দুঃখ কষ্টকে স্বীয় অভিপ্রায়ে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তিনিই আজ স্বেচ্ছায় নীরব স্থানে কর্ম্মহীন অবস্থায় বসতি করিবার করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন এবং একাধিক্রমে দীর্ঘ ছয় বৎসর বাহ্যিক ঝঞ্ঝাটবিহীন অবস্থায় বিতারা গ্রামে বসতি করিলেন। বিতারা গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী সাচার প্রভৃতি গ্রামের ভক্তগণ সময় সময় মায়ের দর্শন পাইতে আসিত এবং তাহার সারগর্ভ উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইত।

গ্রামের লোকেরা ইতি পূর্ব্বে তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত বটে, কিন্তু তাহার উন্নত দেব-চরিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের আত্মীয় স্বজনেরা তখন তাহার অভিনব ভাবে ভাবান্বিত হইয়া তাহাকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সকলেই তাহার পূত চরিত্রে ও উদাস ভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, মাকে ভক্তি করিত, কিন্তু তাহার মহিমা ততদূর বুঝিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত ভক্ত তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধা করিতেছিল দেখিয়া এবং তাহার সৌম্যভাব ও সমাধি প্রাপ্তির অবস্থা পরিদর্শন করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীরা মাকে সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। সাচার জমিদার বাড়ীর পরিজন মায়ের প্রিয় ভক্ত হইয়া দাড়াইল—তাহারা মায়ের সেবা যত্ন করিতে অভিলাষী হইয়া মাকে সময় সময় সাচার গ্রামে নিজ বাড়ীতে নিয়া রাখিত। রসিক তখন সাচার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়া মায়ের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিত মায়ের সর্ব্ববিধ সেবা রসিক নিজে করিত এবং সততই মায়ের সহযোগে বিতারা বসতি করিত। তখন বিতারা গ্রামের ধরনী দাস, ওমর আলী নামক জনৈক ধরনী দাসের সহচর, স্কুলের ছাত্র সুরেশ, রমণী ও মায়ের নিজ ভ্রাতা যতীন্দ্র—মায়ের স্বর্গীয় ভাবপ্রবাহে ও অপরীসিম তত্ত্ব-ভাবের কিরণে প্রদীপ্ত হইয়া নিজ নিজ জীবন তত্ত্বালোকে প্রতিফলিত করিবার জন্য প্রয়াসী হইল এবং সেই

ভাব-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন ধন্য করিয়া লইল।

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের তৎকালীন জীবন ধারায় তদীয় তত্ত্বো-পদেশের পুস্তিকা প্রণয়নের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মজ্ঞ মা যে সকল উপদেশ কথা বলিতেন রসিক তাহার অধিকাংশ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সে উপদেশমালা তত্ত্ব-জগতে অমূল্য-রত্ন স্বরূপ—সরল ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত ঐ উপদেশগুলি বৈদান্তিক তত্ত্বকে প্রতিফলিত করিয়াছে এবং প্রাক্তণ জগৎ-গুরু মহাপুরুষদের উপদেশের সমকক্ষ আকারে পরিগণিত হইয়াছে। মাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইত সে গুলির ধারা লইয়া রসিক "প্রশ্নোত্তর মালা" নামক পুস্তিকা লিখিয়া রাখিতে সুযোগ পাইল। ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বঃত-প্রণোদিত হইয়া কতিপয় তত্ত্ব-ভাবের সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিলেন এবং রসিক তাহা লিপিবদ্ধ করিল। এই সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞ মা জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম মীমাংসা নামক একটী নাতি দীর্ঘ রচনা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সাধনার সহজ প্রণালী এবং বিচার পূর্ণ তত্ত্ব-কথা এই উপদেশগুলির প্রাণ এবং এই গুলি ধর্ম্ম পিপাসু জনের হৃদয়ে অমিয়-ধারা সিঞ্চন করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।



অষ্টমী বল্লী

ভক্ত সমাগমের দ্বিতীয় পর্য্যায়।

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহ-ধারণং লোকস্যাপ্ৰুকারার্থম্। ইতি শ্রুতিরপি—আসচ্ছাদন-স্বশরীরং নোপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহধারণ কেবলমাত্র পরের উপকারার্থ। শ্রুতি ও বলিয়াছেন—জীবন্মুক্তের উপবেশন আচ্ছাদন ও স্ব-শরীর উপভোগের নিমিত্ত নহে। মুক্ত ব্যক্তির দর্শনের দ্বারা লোকের পাপক্ষয় হয়, ভজনের দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রেয় বৃদ্ধি এবং সম্ভাষণ দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। এই জীবজগৎ সঙ্কুল বিশ্বের পরিচালক বিধাতার বিধান গূঢ় রহস্য-জালে সমাবৃত। কোন্ অনন্ত শক্তির অজ্ঞাত ইঙ্গিতে চরাচর সৃষ্টি প্রবাহ চলিতেছে বলা ও বুঝা দুরূহ। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের চিত্ত বিচার প্রবণ ছিল বলিয়া তিনি দেহাতীত অবস্থা লাভের জন্য প্রায়ই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেন এবং পক্ষান্তরে ভক্তদের প্রতি তদীয় চিত্তের আকর্ষণ অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে দিন কর্ত্তন করিতেন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রারব্ধ ভোগ করিবার পর দেহাতীত নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ করেন—মুক্ত ব্যক্তির ও প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত দেহাবসান হয় না; ইহা শাস্ত্রানুমোদিত বাক্য। ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রারব্ধ ভোগ কথাটা সময়ে সময়ে স্বীকার করিতেন এবং কখন কখন সমাধি-ব্যুত্থিত হইয়া জীবন মুক্তের প্রারব্ধ ও অস্বীকার করিতেন। "অবাঙ্ মনস গোচরং" অবস্থা ধারণা করা অসম্ভব—ইহা

কেবল উপলব্ধির বিষয়; উপলব্ধি করিয়া যাহা বলা যায়, যাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহার আভাস মাত্র ভাষার ব্যক্ত জিনিস। ব্রহ্মজ্ঞ মা তাঁহার তদানীন্তন অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে ইহাই বলিতেন যে উপলব্ধির বিষয় কথায় বলা চলে না। তিনি বলিতেন "তোমরা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর—তবেই আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে—নতুবা আমার অবস্থা সম্যক্ বলিয়া বুঝাইবার জিনিষ নহে"। উচ্চতম তত্ত্ব-জ্ঞানের অবস্থা লাভ করিয়া এবং সমাধি-রসের উচ্চ অবস্থা আস্বাদন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা কেমন করিয়া লোক কল্যাণের হেতু হইয়া বিচরণ করিতেন তাহা আমাদের পক্ষে বলা ত দূরের কথা ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজেই জ্ঞাপন করিতেন যে—কি যে জটিল ব্যাপার তাহা তিনি নিজেই সম্যক বুঝিতে পারেন না—ইহার অর্থ এই যে জীবন্মুক্ত হইয়া তিনি বিচার ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া—সকল কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কি অপূর্ব্ব রহস্য! কি অঘটন ঘটপটিয়সী মায়া।

ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বীয় জন্মভূমি বিতারা গ্রামে ১৩২৩ বাংলা সন হইতে ১৩২৮ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর নির্জ্জন ভাবে লোক-বহুলগঞ্জনার বাহিরে থাকিয়া কতিপয় প্রিয় ভক্তের সহযোগে দিনাতিপাত করেন। তখন তদীয় প্রিয়ভক্ত রসিক মায়ের সেবাকার্য্যের প্রধান সহযোগী ছিল। তখন রসিক সততই মায়ের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল—সে সর্ব্বদাই মায়ের সেবা কার্য্যেলিপ্ত

থাকিয়া মায়ের অসুস্থ শরীরের পরিচর্য্যাদি করিয়া চলিত। অবিবাহিত যুবক ভক্ত রসিক ব্রহ্মজ্ঞ মা এর অনুপ্রেরণাই চির কৌমার্য্য ব্রতে অধিষ্ঠিত হইয়া তত্ত্বানুসন্ধানের পথে চলিতেছিল। কিন্তু স্বীয় জীবনের ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার বশে, অর্থ চিন্তার বশে স্থানীয় সাচার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হইল। সে মায়ের সেবা কাজে বিতারা মায়ের নিকটই অবস্থান করিত এবং তথা হইতেই সাচার স্কুলে শিক্ষকতা করিত। মায়ের সেবা কার্য্য মা নিজের ইচ্ছাক্রমে রসিকের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন এবং তাহার পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। অন্য কেহ সেবা কার্য্যের জন্য ইচ্ছুক হইলে ও মায়ের তাহা রুচিকর ও সুখকর হইত না। মাএর সেবা কার্য্যে অন্য প্রদত্ত অর্থাদি ও মা তত পছন্দ করিতেন না; রসিকের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চাহিয়া তিনি রসিকেরই সর্ব্ববিধ সেবা লইতে অভিলাষী হইতেন; এমন কি দুই এক দিনের জন্যও তিনি পরিচর্য্যার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিতে চাহিতেন না। তখন রসিকের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ ও প্রীতির ভাব একটা প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় হইয়াছিল। মাকে দর্শন করিবার জন্য, মায়ের উপদেশ পাইবার জন্য ধরণী, উমেশ অতুল, হরিপ্রসাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রায়ই যাওয়া আসা করিত। মা সকলের সহিতই নিজ অভিপ্রায় মত কথোপকথন করিয়া আনন্দ পাইতেন। বাহির হইতে কোন

ভক্ত মায়ের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিলে মা পূর্ব্ববৎ অবিশ্রান্ত ভাবে উপদেশ দিতে চাহিতেন না—কেবল সরল ও সহজ কথায় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়া নীরব অভিপ্রায়ে চলিতেন।

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই মায়ের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে মা প্রায়ই দৈহিক গ্লানিতে ভুগিতেন—কখনও তাঁহার মাথা-ধরার পীড়া থাকিত, কখনও তিনি দুর্ব্বলতার দরুণ শ্বাস কষ্টে যন্ত্রণা পাইতেন—প্রায়ই তাঁহার আহারে রুচি থাকিত না। দুর্ব্বলতাই প্রধান উপসর্গ ছিল। ভক্তগণ তাঁহার পীড়ার চিকিৎসা বিধানে যথোচিত প্রয়াসী হইত —উপযুক্ত চিকিৎসকের বিধানেও তাঁহার রোগের সম্যক উপশম হইত না—সাময়িক নিবৃত্তি হইত। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শারীরিক যাতনা বৃদ্ধি পাইলে কখন কখন তিনি সমাধি রসে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চাহিতেন—কিন্তু সেই সমাধি অবস্থা মায়ের পক্ষে বিশ্রামপ্রদ ও শান্তিজনক হইলেও, তাঁহার শরীরে উহার প্রভাব উদ্বেগকর হইত—দেহ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইত। এই জন্য প্রিয় ভক্তগণ অধীর হইয়া যথাবিহিত অবস্থার জন্য তাঁহাকে সমাধি ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করিত। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মন যাহাতে সমাধি অবস্থা হইতে অবতরণ করিয়া নীচু ভূমিতে বিচরণ করে তৎপ্রতি ভক্তদের চেষ্টা চলিত। তাঁহাকে সমাধি অবস্থা হইতে নীচ ভূমিতে আনিবার জন্য তাঁহার প্রিয় ভক্তদের আবদার ও

আহ্বান সহজে কার্য্যকরী হইত বলিয়া তদীয় প্রিয়ভক্ত রসিক মাকে সমাধি ভঙ্গের জন্য নানাবিধ উপায়ে আহ্বান করিত ও যাতনা দিত—সমাধি ব্যুত্থিত হইয়া তিনি প্রিয় ভক্তকে নিকটে পাইলে কথঞ্চিৎ উদ্বেগ রাহিত্য বোধ করিতেন—নতুবা তীব্র ব্যথার অধীর ব্যক্তির মত ত্যক্ত ভাব দেখাইতেন। মায়ের সেবাকার্য্যে তদীয় অন্যতম ভক্ত যতীন্দ্র (মায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) রসিকের কার্য্যের পরিপোষকতা করিত—যতীন্দ্রের তখন ছাত্রাবস্থা—সাচার স্কুলেই সে অধ্যয়ন করিত। মায়ের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের পরিচর্য্যার ভার রসিকের প্রতি ন্যস্ত ছিল যতীন তাহার সহায়ক রূপে পরিচর্য্যার কাজে, খাদ্যাদি প্রস্তুত ব্যাপারে, উপস্থিত আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কাজে অগ্রগামী ছিল। ধরণী, অতুল, হরিপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তগণ মায়ের দৈনন্দিন সেবাকাজে কোন সহায়তা করিতে না পারিলেও অন্যান্য প্রকারে মায়ের প্রতি তাহাদের আন্তরিক ভক্তির পরিচয় দিয়া চলিত।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের তৎকালীন দেশে অবস্থান কালে গ্রামস্থ বহু-লোক তাহার প্রতি অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। যাহারা মায়ের উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে অক্ষম ছিল তাহারা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইল এবং যাহারা পূর্ব্ব হইতে মায়ের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিল তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সুযোগ মত সে সকল গ্রামবাসী ভক্ত মায়ের নিকট আসিয়া তাঁহার অমিয় উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়া—জীবন তত্ত্ব-ভাবে চালিত করিতে প্রয়াসী হইল। বগলা সরকার, শরৎ নমঃ,

জগৎ চন্দ্র দে, অনঙ্গ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পূর্ব্বতন ভক্তগণ এবং ধরণী দাস, উমেদালী (মুসলমান), রমণী চক্রবর্ত্তী, সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অধুনাতন ভক্তেরা ব্রহ্মজ্ঞ-মাএর তৎকালীন ভাবপ্রবাহে অবগাহন করিয়া নিজ নিজ জীবন তত্ত্ব-ধারায় ডুবাইয়া দিবার প্রয়াস পাইল। মায়ের ভাবাকর্ষণে যুবক ভক্ত যতীন্দ্র, রমণী, ধরণী, ও সুরেশ প্রভৃতির জীবনে নূতন ভাব-ধারা উৎপত্তি হইতে লাগিল এবং ইহারাই পরজীবনে মাএর আদর্শে পরিচালিত হইয়া মায়াময় জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই সময় অনঙ্গ সর্ব্ব প্রথমে মায়ের অনুমতিক্রমে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হরিদ্বারে বস-বাসের জন্য প্রস্তুত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের ভক্তদের মধ্যে অনঙ্গই সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিল এবং ঋষিকেশ নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতেছিল। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের অপূর্ব্ব ভাব-প্রেরণায় ভক্তদের প্রাণে ক্রমশঃ তত্ত্ব-ভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল—তাহারা সংসারের অনিত্যতা, নশ্বর জীবনের অসারতা ক্রমশঃ জীবনে অনুভব করিতে লাগিল এবং সত্য তত্ত্বান্বেষণে প্রয়াসী হইল—তাহারা সকলেই সাধন পথে নিজ নিজ মনের গতি অনুসারে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বাসনা ও কামনা বিজড়িত জীবনে মুক্তির আস্বাদন লাভে নিস্কামতালাভ ও বাসনা ত্যাগই যে একমাত্র সাধনা ইহাতে দীক্ষিত হইয়া ভক্তগণ গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। মা উপদেশ দিতেন "বাসনাই বন্ধন মন হইতে অনিত্য বাসনার জাল ছেদন করিয়া

উদাসীন মনে আত্ম-চিন্তা করিলে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। সত্য ও তত্ত্ব-বিচার করিয়া অনিত্য বিষয়ে মনের নিস্কামত্ব জন্মিলে সেই শুদ্ধ-মনে আত্ম-ভাব প্রস্ফুটিত হয়।" ভক্তগণ সে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতে অভ্যস্ত হইল। আত্ম-চিন্তা এবং ভগবৎ-চিন্তা অনুসরণে সতত মনের বাসনা বিরহিত অবস্থা পাইবার জন্য যে প্রয়াস তাহাই সাধনা—ভক্তগণ সে সাধনায় দীক্ষা পাইয়া স্ব স্ব জীবন—সেই ভাবে চালিত করিতে উপদিষ্ট হইল ও ধাবিত হইল।

বর্ষের পর বর্ষ অতীত হইল; এবং সময়ের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সতত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির নিয়ম সকলেরই উপর তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া অপূর্ব্ব লীলার উদ্ভব ও সমাধান করে। দীর্ঘকাল বিতারা গ্রামে বাস করিবার পর ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের প্রাণে নূতন চঞ্চলতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বের মত একভাবে অবস্থান করিতে অনভিলাষী হইয়া মানসিক উদ্বেগে দিন কাটাইতে ছিলেন এবং মর-জগতে অবস্থিতি করা বিড়ম্বনা সূচক বলিয়া সতত বিরক্তিভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মা তাঁহার প্রিয় ভক্ত রসিকের প্রতি পূর্ব্ববৎ আসক্ত ভাব প্রদর্শনে বিমুখতা দেখাইয়া চলিতে ছিলেন এবং রসিকের প্রতি তাঁহার স্নেহাকর্ষণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মায়ের অন্যমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। ভক্তেরা ভাবিলেন বুঝি বা ব্রহ্মজ্ঞ মা মহানির্ব্বাণ পথে অগ্রসর হইতেছেন। এইভাবে কয়েকদিন

অতীত হইলে পর একদিন ব্রহ্মজ্ঞ মা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রের সহযোগে গাঙ্গাটিয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন—তাঁহার সতত সহচর ও সেবক রসিক তাঁহার সঙ্গে যাইবার সুযোগ পাইল না। কতক দিন পরে ভক্ত রসিক তদীয় গুরুভ্রাতা হরিপ্রসাদের সহযোগে গাঙ্গাটিয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া মায়ের পদ-প্রান্তে মিলিত হইল এবং তাঁহার বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-বারি লাভ করিল। তৎকালে মা অস্থির মন-গতি নিয়া সেই গ্রামবাসী ভক্তদের সঙ্গে তত্ত্বোপদেশ ছলে এক নূতন খেলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই গ্রামবাসী বহু ভক্তই মায়ের অপূর্ব্ব দিব্য-ভাবে মাতোয়ারা হইল এবং কৈলাস চক্রবর্ত্তী নামক একজন ভক্ত মায়ের বিশেষ করুণার পাত্র হইল। ব্রহ্মজ্ঞ মা কৈলাসের প্রতি নূতন ভাবাকর্ষণ বিস্তার করিয়া নূতন ভাবে দেশান্তরে কালাতিপাত করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। রসিক ও হরিপ্রসাদ মা-কে দেশে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু মা কৈলাশ চক্রবর্ত্তীকে সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে স্থান দিলেন এবং মায়ের মনোরঞ্জন সাধনে উৎসুক কৈলাশ মায়ের নির্দ্দেশ মত কতিপয় দিবস মায়ের-নিকট অবস্থান করিল। তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞ মা কৈলাসের সেবা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া কুমিল্লা যাইয়া বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে ব্রহ্মজ্ঞ মা এর-চক্ষু যন্ত্রনা বৃদ্ধি পাইল. শারদীয় পূজার শেষ কালে রসিক ও হরিপ্রসাদ মাকে ঢাকা নগরীতে চক্ষু-চিকিৎসার জন্য লইয়া গেল; মাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে চশমা-ব্যবহারের বন্দোবস্ত করিয়া

তাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তৎকালে ঢাকাতে ভক্তেরা মাএর সহযোগে একটী পিলিন নৌকা ভাড়া করিয়া আট-দশদিন বুড়ী গঙ্গার বক্ষে অবস্থান করিয়া মহানন্দ উপভোগ করিয়াছিল এবং মাও একটু পরিবর্ত্তনের মাঝে সাময়িক তৃপ্তি পাইয়াছিলেন। তিনি গাড়ী সহযোগে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। সুখের পর দুঃখ প্রকৃতির নিয়ম, সেই জন্যই যেন ফিরিবার কালে রসিক পথিমধ্যে কলেরা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; মায়ের কৃপা-কটাক্ষে রসিক অসহায় অবস্থায় ও জীবন ফিরিয়া পাইল—তখন চিকিৎসার কোন পন্থা না পাইলে ও মায়ের আশীর্ব্বাদ বলে রসিক রোগমুক্ত হইল। ইহার কিছু দিন পরে মা দেশ হইতে কুমিল্লা চলিয়া গেলেন। তখন ১৩২৯ সনের অগ্রহায়ণ মাস। যেহেতু মায়ের মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাই তিনি রসিককে দেশে রাখিয়া কুমিল্লা গেলেন তখন কৈলাস মায়ের সেবার অধিকারী হইয়া তাহার যথোচিত যত্ন নিতে লাগিল। রসিক মায়ের প্রিয় ভক্ত; সে মায়ের সান্নিধ্য লাভের জন্য পৌষ মাসেই কুমিল্লা পৌঁছিল এবং মায়ের অপূর্ব্ব ভাব-পরিবর্ত্তন দর্শন করিল—মা কিছুতেই শান্তি বোধ করিতে পারিতেছিলেন না; তিনি পুনরায় রসিকের উপস্থিতিতে তাহাকেই সেবা কার্য্যের ভারে নিয়োজিত করিলেন।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মানসিক ভাবের এতাদৃশ অধীরতা

পরিলক্ষিত হইল যে তিনি কোন ভক্তের প্রতিই পূর্ব্ববৎ ভাব প্রবাহে ও স্নেহ সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছিলেন না। কিছুতেই তাঁহার চিত্ত শান্ত থাকিত না; কখন কখন তিনি সমাধি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সমাধি অবস্থা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইলে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মানসিক ভাব; ভক্তদের প্রতি আরো হাল্‌কা হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় ভক্তেরা তাহাকে নানাবিধ উপায়ে সমাধি ভঙ্গ করাইয়া রাখার চেষ্টা করিত। একদা সমাধি ভঙ্গকালে মা স্বর্ণ কমলকে সম্মুখে পাইয়া তৃপ্ত বোধ করিলেন। তাহাতে স্বর্ণকমলের প্রতি মায়ের প্রীতি ও স্নেহ ভাব নূতন আকারে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে কয়েক মাস ভক্তেরা আনন্দে যাপন করিল—তখন মা কুমিল্লা নগরীতে রাণীর দিঘীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত এক ভাড়া-ভাড়ীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। তখন ভক্তেরা মায়ের সহযোগে বসতি করিয়া নূতন নূতন ভাবের পরিস্ফুটনে মহানন্দে দিন কর্ত্তন করিয়াছিল। সেখানে মায়ের ভক্ত গিরিশ, রসিক, অতুল হরিপ্রসাদ, ধীরেন্দ্র, স্বর্ণকমল সকলের একত্রে মিলনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তেরা সকলেই যথাসাধ্য মায়ের চিত্ত-বিনোদনে উৎসাহী ও উদ্যোগী হইলেও মায়ের চিত্ত বিক্ষেপ ও অস্থির গতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। মা তৎকালে জন-সমাগম প্রীতিকর মনে করিতেন না; কাজেই বাহিরের লোক মাকে পূর্ব্ববৎ তত্ত্বোপদেশ ও ধর্ম্মালোচনায় ব্যপৃত দেখিবার সুযোগ পাইত না। মায়ের মানসিক অধীরতার ভিতরে ভক্তেরাই

মিলিত হইয়া মায়ের চিত্ত-বিনোদন করিত এবং নানাবিধ ভাবে তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আনন্দ পাইত। সহরের বিশেষ পরিচিত ভক্তদের মধ্যে গোপীমোহন চৌধুরী ও তাহার বাসার লোক, রমেশ সেনদের বাসার লোক প্রভৃতি আসিয়া মাকে দর্শন করিত। মা প্রিয় ভক্তগণ সহ এইভাবে মাস কয়েক অতিবাহিত করিলে পূর্ব্ববৎ স্থির গতিতে থাকার ভাব ও ইচ্ছা পরিপোষণ করিতে ছিলেন না। মা সততই ইঙ্গিত করিতেন ও বলিতেন যে তাহার মন অবস্থা বিশেষে আবদ্ধ না হইলে তিনি উদ্বেগ-রহিত অবস্থা পাইবেন না, বরং সমাধি-রসে ডুবিয়া নির্ব্বাণ পাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। তৎকালে মায়ের চিত্তে নূতন ভাব উদ্ভব হইবার একটী হেতু উপস্থিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সাচারবাসী জ্ঞানদা প্রসাদ সেন মাকে দর্শন করিতে আসিতে-ছিল—তাহার মায়ের প্রতি বিশেষ ভাব ছিল না। সাচার বাড়ীতে মাকে জ্ঞানদা অনেক বার দেখিয়াছে—কিন্তু বর্ত্তমানে জ্ঞানদার মনে বিবাহ ব্যাপারে মায়ের কৃপা যাচ্না্র এক ভাব উপস্থিত হইল মাকে "সিদ্ধা" বলিয়া ধারনা করিয়া জ্ঞানদা মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া বর (আশীর্ব্বাদ) প্রার্থনা করিল। মায়ের উদাসীন মন জ্ঞানদার প্রতি আসক্ত হইল। এবং তাহার পূর্ব্বতন কথার পরিপালনেই যেন জ্ঞানদাকে স্নেহ-বন্ধনে জড়িত করিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভের পর নির্ম্মল মতি কতিপয় যুবক ভক্তের প্রতি প্রেমাকর্ষণ বিস্তার করিয়া যে লীলাখেলার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার পর একটি ভিন্ন প্রকৃতির যুবককে ও

তিনি ভালবাসার দ্বারা সত্যপথে টানিয়া আনিবেন বহুপূর্ব্বে এই-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে কোন বাসনার রেখাপাত হইলে সেই বাসনা পরিপূর্ণ হইবেই। তিন বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞ মা (বিতারা বসতি কালে) একদা ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন; রসিক, তোমরা নিজেরা সৎ ও ভাল বলিয়া গর্ব্ব কর কিন্তু তোমাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য আমার মন একটী মন্দ স্বভাবের লোকের প্রতি আকর্ষিত হইবে।" জ্ঞানদার প্রতি মায়ের যে ভালবাসা জন্মিল তাহা তদীয় পূর্ব্বকথার স্মারক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মায়ের মনোগতির পরিবর্ত্তনে রসিকের মনে বিষাদের ছবি উদিত হওয়াতে মা বলিয়াছিলেন—"যে যাহাই বলুক আমার মন স্বাধীন—আমার স্বাধীন মন গতিতে বাধা দিও না—তোমরা যে ভাব পাইয়াছ সে ভাবে চল—নিজ নিজ আত্মোন্নতি সাধনে মন দেও—আমি নিজ ইচ্ছায় কিছু করি বলিয়া মনে হয় না—আমি কিছুকাল তোমাদের প্রতি ভালবাবায় মুগ্ধ ছিলাম; এখন আমার যে ভাব তাহাও স্থায়ী হইবে না; আরো একটী সৎ যুবকের প্রতি আমার ভালবাসা ও ভাবাকর্ষণ হইবে।" সিদ্ধি-শক্তির প্রতি ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের বিরক্তি ছিল; বিচার-প্রধান মায়ের মনে সিদ্ধি-শক্তি এক রকমের বন্ধন বলিয়াই অনুভূত হইত। তিনি সিদ্ধি-শক্তিকে আত্মানুরাগের বিরোধী বলিয়া জানিতেন। কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল ও নিরাকাঙ্খা চিত্তে কোন ভাব ফুটিলে তাহা অব্যর্থ হইত—ইহা তিনি জ্ঞাপন করিতেন। বিতারা গ্রামে বসতি কালে মা একদিন রসিককে হঠাৎ বলিলেন

যে একটী বড় লোক মারা যাইবে। রসিক প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাইল না—মা কথাটা চাপা রাখিলেন—কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার ভ্রাতা সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদেশে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া খবর আসিলে পর মা রসিককে জ্ঞাপন করিলেন যে এই সেই বড়লোক—সে মরিবে—বাঁচিবে না-বাস্তবিক তাহাই হইল পরদিন মৃত্যু সংবাদ আসিল। এবং বিধ ঘটনা মায়ের ইচ্ছাকৃত সিদ্ধি শক্তির পরিচায়ক নহে তাহার নির্ব্বিকল্প মন সাগরের তরঙ্গ স্ফূরণ মাত্র। মা যখন জ্ঞাপন করিলেন যে অন্য একটী সৎ যুবকের প্রতি ভাবাকর্ষণে তিনি মত্ত হইবেন; তখন রসিক ইহার সত্য বুঝিবার জন্য আগ্রহ দেখাইল না কিন্তু পরিশেষে সুরেশ ঘোষের প্রতি মায়ের ভালবাসার ব্যাপার দেখিয়া সে মায়ের মুখ নিঃসৃত পূর্ব্ব কথার যথাযথ সত্য বুঝিতে পারিল। সুরেশ ফরিদপুর জেলার বিশিষ্ট ঘোষ বংশোদ্ভব কায়স্থ যুবক, সে বিবাহিত এবং কলেজের অধ্যক্ষতা কাজে নিযুক্ত ছিল। মায়ের কৃপাপাত্র হইবার পর মায়ের জীবনের শেষ চারি বৎসর মায়ের সেবা ও পরিচর্য্যা বিধানে সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল ও অন্যান্য ভক্তদের সহযোগে মায়ের সেবার বিধান করিয়া ও গুরু ভাইদের প্রতি শিষ্টাচারে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার সৎ ভাবের পরিচয় দিয়াছিল এবং প্রবুদ্ধানন্দ নামে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা জ্ঞানদাকে অন্যতম প্রিয়ভক্ত স্বরূপে গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানদা মায়ের অহৈতুকী কৃপা পাইল। সে

বিবাহ কার্য্যে মনোমত সফলতা পাইবার জন্য মায়ের নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু মায়ের অপার কৃপা বলে সে কাচ অন্বেষণে হীরার অধিকারী হইল। সে মায়ের সেবা কার্য্যে মন ঢালিয়া দিল এবং একাধিক্রমে চারি বৎসর মায়ের নিকট থাকিয়া মায়ের সেবা কার্য্য পরিচালনা করিল—নিজের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল তাহার পূর্ব্ব জীবনের ভাব-ধারা পরিবর্ত্তিত হইল সে সৎসঙ্গে সাধুভাবে জীবন যাপনের জন্য অভিলাষী হইল। কিছুদিন পরে মায়ের মন তাহার প্রতি শিথিল ভাবে পর্য্যবসিত হইল এবং জ্ঞানদা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিবাহিত জীবনের ভিতরেও সে মায়ের কৃপা সম্বল করিয়া সাধু ভাবে জীবন চালাইবার জন্য ব্রতী ছিল। তাহার চরিত্রে মায়ের যে অমোঘ প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল সে ধারা সে ভুলিতে পারে নাই সে ধারায় জ্ঞানদার জীবন প্রবাহ চলিতেছিল। মা বলিয়াছিলেন "গাছের গোড়ায় জল সেচন না করিলে গাছ সচেতন ও পরিপুষ্ট হয় না কিন্তু সে অমোঘ বীজ ভক্তদের প্রাণে বপিত হইল তাহা কোন রকমেই নষ্ট হইবে না—এক জীবনে না হয় তিন জীবনে তাহার ফল পরিদৃষ্ট হইবে।"

কুমিল্লা নগরীতে এই ভাবে কয়েক মাস অতীত হইল —মা পুনরায় বিতারা-গ্রামে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—কিন্তু জ্ঞানদার অনুরোধে কুমিল্লা গঙ্গাচরস্থিত সাচারের বাসায় আরো কয়েক মাস বসতি করেন—কিন্তু পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে তিনি বিতারা চলিয়া যান। বিতারা গ্রামে

নির্জ্জন স্থানে তাহার স্বভাবোচিত চিন্তাধারায় দুইমাস কাটাইবার পর তিনি জ্ঞানদা ও অন্যান্য ভক্তগণ সহযোগে কুমিল্লা আসিয়া বসতি করেন। তখন কুমিল্লা নগরীর মনোহরপুর অঞ্চলে ইন্দুদত্তের দালানে বাড়ীভাড়া করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মাকে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। সে স্থানে নিজ ভক্তগণ সহযোগে মা কয়েক মাস ভক্তদের আত্মার উন্নতি বিধানের চেষ্টা নিয়া নিরিবিলি ভাবে বসতি করেন। ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজে ধরা না দিলে তাহাকে বুঝিতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল ছিল। তিনি অন্তরের ভাবে ডুবিয়া বাহিরে আড়ম্বর বিহীন ভাবে চলিতেন—ভাবের প্রবাহে বহু সময় নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া লোক সমাজকে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইলে কাহার কথায় নিবৃত্ত হইতেন না; পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজে নিবৃত্ত হইয়া কখন কখন একেবারে নির্জ্জনে বসতি করিতে প্রয়াসীহইতেন কেহ উপদেশ পাইতে চাহিলেও সরিয়া থাকিয়া নির্জ্জন বাসই অধিকতর পছন্দ করিতেন, মায়ের চির রুগ্নশরীর আবোরুগ্ন হইল। মা যদিও কুমিল্লাতে 'ভক্তদের চিন্তা নিয়া নানাবিধ প্রসঙ্গ লইয়া আনন্দেই দিনাতিপাত করিতেছিলেন তথাপি হঠাৎ তাহার মনোগতির পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি বিতারা গ্রামে কুমিল্লা হইতে চিরতরে বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন ঘটনাক্রমে রসিক নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল—জ্ঞানদার উপরই মায়ের যথাবিহিত সেবা যত্নের ভাব ন্যস্ত হইল তখন জ্ঞানদা সর্ব্বদা মায়ের নিকট থাকিতে অসমর্থ হওয়াতে সুরেশ (পরমানন্দ স্বামীজি) মায়ের নিত্য সেবার

ভার লইল। রসিক জ্ঞানদার ব্যবহারে গ্লানি পরবশ হইয়া বিতারা বসবাসের ইচ্ছা পোষণ না করিলেও সময় সময় উপস্থিত হইয়া মাকে দর্শন করিত। এইভাবে সুরেশ বৎসরাধিক কাল মায়ের সেবা করার সুযোগ পাইয়াছিল। 'কালের কুটিলা' গতি বলিয়া যে জন প্রবাদ আছে তাহার ভাব সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা জ্ঞানদার ব্যবহারে তিক্ততা বোধ করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রতি তাঁহার বিমুখতা পরিদৃষ্ট হইল। ব্রহ্মজ্ঞ মা জ্ঞানদার নিকট হইতে সরিয়া পড়িবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; স্বাধীনচেতা ব্রহ্মজ্ঞ মা অন্য ভক্তের সেবা গ্রহণে প্রয়াসী হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় যখন যেই ভক্তকে সেবার ভার দিয়াছেন সেই ধন্য হইয়াছে। মা রমেশ সেনকে (গাঙ্গাটিয়া বাড়ী) সংবাদ দিয়া আনাইয়া তাহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রমেশের ঐকান্তিক যত্নে এবং সুরেশ ও যতীন্দ্রের পরিচর্য্যায় ব্রহ্মজ্ঞ মা বৎসরাধিক কাল বিতারা বসতি করেন। তখন তাঁহার নিবৃত্ত-চিত্তে নির্ব্বাপিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত যে বাসনা কণা নিমজ্জিত ছিল তাহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইলেন ব্যহ্যিক ব্যাপারে কিন্তু তাঁহার প্রাণে শান্ত ভাব স্থান পাইল না। তিনি সুরেশ ও রমেশকে সঙ্গে লইয়া বহু বর্ষ পরে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং ধীরেন্দ্র সেনের দমদমস্থ বাড়ীতে বাস করিলেন।

তৎসময় ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মন ভক্ত-বিশেষের প্রতি আসক্তির অভাবে নির্ব্বাণমুখী হইয়া বিচরণ করিতেছিল—তখন

তাঁহার ঘন ঘন সমাধি ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। মায়ের মন অবস্থা বিশেষে নিবিষ্ট না হইলে তিনি বেশী দিন এই দেহে অবস্থান করিবেন এই আশা করা যাইতেছিল না। মায়ের মন উদাসী এবং ততোধিক শরীর রুগ্ন দেখিয়া রমেশ সুরেশ ধীরেন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে তাঁহাকে রাঁচী স্বাস্থ্যবাসে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ মা সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন—তাহারা রাঁচী যাইবার পথে মানভূম জেলায় অবতরণ করিল। রমনী (শাশ্বতানন্দজী) সেখানে পুঞ্চাগ্রামে নদীর পারে কুঠীর নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতে-ছিল। সেই গ্রামের সুযোগ্য-নেতা রামপদ মুখার্জি তাহার সাহায্য ও সহায়তা করিত। ব্রহ্মজ্ঞ মা সেই পুঞ্চগ্রামে যাইতেছেন জানিয়া রামপদ বাবু তদীয় পরিবারস্থ লোকজন সহ মাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাড়ীতে নিয়া গেল এবং তাহার থাকিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিল। রামপদ বাবু ও তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ অতিশয় নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্ম-প্রাণ লোক ছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের-আগমনে তাহারা এক আনন্দ ধামের সৃষ্টি দেখিতে পাইল এবং অন্যান্য ভক্তগণের সমাবেশে নূতন আনন্দ পাইয়া পুলকিত চিত্তে দিন কর্ত্তন করিল। রামপদ বাবু কেবল ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সেবা ও যত্ন নিতে তৎপর ছিলেন এমন নহে তিনি উপস্থিত মায়ের অন্যান্য ভক্তগণের প্রতি সাধু ব্যবহারে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মা ভক্তগণ

সমভিব্যহারে পুঞ্চাতে তিন মাস বসতি করিলেন। উপস্থিত ভক্তদিগকে তত্ত্বোপদেশ দিবার সময় ব্রহ্মজ্ঞ মা ঘন ঘন সমাধি-রসে ডুবিয়া পড়িতেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত রোগ-ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল ছিল—এই জন্য ঘন ঘন সমাধি-ভাব পাবার ফলে মায়ের মন ও শরীর এজগত হইতে বিদায় লইবার জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছিল। সঙ্গীয় ভক্ত শাশ্বতানন্দ, সুরেশ ও যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী-দ্বয় মায়ের যথাবিহিত যত্ন ও সেবা করিতে ত্রুটি করিল না—পুঞ্চার অন্যান্য ভক্তেরা মাকে যথাসাধ্য সেবা ও যত্ন দ্বারা পরিতুষ্ট করিবার প্রয়াস করিল। মায়ের মন ক্রমশঃ উদাসীন হইতেছিল। একদিন ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল সমাধি অবস্থায় থাকেন। ইহাতে শাশ্বতানন্দজী ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দেশে মায়ের প্রিয় ভক্ত অতুল ও রসিককে তারযোগে মায়ের অবস্থা জ্ঞাপন করিল—তাহারা এই দীর্ঘ পথ সহসা অতিক্রম করিয়া আসিয়া মায়ের দর্শন লাভের সুযোগ পাইতে অসমর্থ হইয়া উৎকণ্ঠায় দিন কতিপয় অতিবাহিত করিল। কিন্তু কিছু সময় পরে মায়ের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ জানিতে পারিল ও নিশ্চিন্ত হইল। যখনই মায়ের মন এই ভাবে উচ্চতম অবস্থায় বিচরণ করিত এবং সমাধি ভাবে বিভোর হইতে দৃষ্ট হইত তখনই তাহার নির্ব্বাণ মুখে ধাবিত চিত্তকে ফিরাইয়া আনার জন্য ভক্তদের প্রাণে যে অপূর্ব্ব আবেগ ও অনুরাগ দৃষ্ট হইত তাহাতেই একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন গোচরীভুত

হইত। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দেহ পীড়ার উপশমের জন্য যখন তাঁহাকে পুরীধামে নিয়া রাখা হইয়াছিল তখন তাহার মন ক্রমশঃ উদাস আকার ধারণ করিয়া নির্ব্বান রসে ডুবিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন ভক্তদের করুণ প্রার্থনায় তাঁহার মনের ও দেহের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। কুমিল্লা নগরীতে বসতিকালে মায়ের-দেহ-পীড়া ও মন গতির পরিবর্ত্তন এতাদৃশ আকারে পরিণত হইয়াছিল যে উপস্থিত ভক্তগণ তাঁহার বাঁচিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল—তখন তাহার প্রিয় ভক্ত রসিকের উপস্থিতিতে তাহার মন নীচ ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তণ করিয়াছিল এবং বিনা চিকিৎসায় দেহ-পীড়ার উপশম ঘটিয়াছিল। পুঞ্চাগ্রামে বসতিকালে মায়ের মন ঘন ঘন সমাধি ভাবে থাকার ফলে নির্ব্বাণ পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও একমাত্র ভক্তদের ব্যাকুল প্রার্থনার ফলেই তাঁহার মন নীচ ভূমিতে ফিরিয়া আসিল। ভক্তদের প্রার্থনা মায়ের মনকে আকর্ষণ করিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা মহানির্ব্বাণে ডুবিবার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তদের হৃদয় বিনোদন করিলেন এবং ভক্তদের প্রস্তাব মত রাঁচী নগরীতে যাইয়া বসতি করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। ভক্ত শাশ্বতানন্দ, যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী ও সুরেশ অন্যান্য ভক্তদের সহায়তা ও পরামর্শ ক্রমে মাকে রাঁচীতে লইয়া গেল। রাঁচী একটী স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান; উহার পার্ব্বত্য দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম—নির্জ্জন-বস-বাসের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। মা সেখানে প্রিয় ভক্তগণসহ

মাসেক কাল অবস্থান করিলেন—কিন্তু তাহার দৈহিক গ্লানি হ্রাস পাইল না—তাহার অম্ল-রোগ বৃদ্ধি পাইল। তখন ভক্তেরা মায়ের যথোচিত চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা নগরীতে নিয়া আসিল।

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের যথোচিত চিকিৎসা বিধানের জন্য ও ভক্তদের সহযোগে স্বাধীন ভাবে ও নির্জ্জনস্থানে বসতি করার জন্য কলিকাতা নগরীর প্রান্তে কারবোলা ট্যাঙ্ক রোডে এক বাড়ী ভাড়া করা হইল। সে বাড়ীর দৃশ্য মায়ের মানসিক অবস্থার অনুকূল হইয়াছিল, তৎকালে অন্যান্য ভক্তেরাও সেখানে আসিয়া সমবেত হইল। স্বামী নির্গুনানন্দ মায়ের সেবা কাজে ব্রতী হইয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল—সুরেশ, রমেশ, শাশ্চতানন্দ, যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী, ধীরেন্দ্র সেন প্রভৃতি মায়ের বহু ভক্ত মায়ের পদ প্রান্তে সমবেত হইল। তখন একমাত্র জ্ঞানদা কলিকাতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাইল না। যোগেন্দ্র মায়ের সেবা কর্য্যে যোগ দিল—কিছুদিন পূর্ব্বে সে মানভূমে সন্ন্যাসী ভাবে অবস্থান করিয়াছিল কিন্তু পর জীবনে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল।

তৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের দর্শনাভিলাষী বহু ভক্ত ও জন সাধারণের ভিতর ধীরেন্দ্র সেনের জনৈক বন্ধু সুরেশ ঘোষ এবং ডাক্তার সুরেন্দ্র মায়ের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়াছিল—মায়ের অহৈতুকী কৃপা তাহাদের উপর বর্ষিত হইল। মায়ের পদ প্রান্তে সুরেশ ঘোষের মিলন রহস্য অদ্ভূত হইয়াছিল। মা ভক্ত বিশেষের

প্রতি আকর্ষণ বিস্তার করিয়া জগতে বিচরণ করিবার প্রণালী খুঁজিয়া লইতেন। বাসনা ব্যতীত মনের গতি বিদ্যমান থাকে না। বাসনা কার্য্য ও কারণ ভেদে বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ মা পরম তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর কেবল ভক্তদের প্রাণে ভাব বিস্তারের আকাঙ্খা নিয়াই জীবিত থাকেন; তখন তাহার অহৈতুকী কৃপা—কটাক্ষে কোন লোক তাহার কৃপা লাভ করিলে পর ব্রহ্মজ্ঞ মা সেই ভক্তানুরাগে অনুরঞ্জিত বাসনা লইয়া জগতে বিচরণ করিতেন। অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত ব্রহ্মজ্ঞ জনের মনবৃত্তি কি ভাবে এই ভাব প্রাপ্ত হইয়া জগতে বিচরণ করে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের কৃপা লাভ করিয়াছি; এবং তাহারই বলে তাঁহার ভাব বুঝিবার কতক সন্ধান পাইয়াছি। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, তাহার সহযোগে অবস্থান করিয়া তদীয় বিচার পূর্ণ তত্ত্বোপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া এবং তাঁহার সম্ভাষণের বলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে কতক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কি ভাবে জগতে বিচরণ করেন তাহা দেখিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের জীবনের লীলা-প্রসঙ্গ কিরূপে গঠিত হইল তাহা কতক পরিজ্ঞাত হইয়াছি।

একদিন ব্রহ্মজ্ঞ মা রমেশ সেনের সহযোগে নিজ কোঠায় নির্জ্জনে উপবিষ্ট আছেন—তখন সুরেশ ঘোষ মায়ের দর্শনের জন্য প্রথম তথায় উপস্থিত হইল এবং নিবেদন করিল যে ধীরেন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়া সে মাকে দর্শন

করিতে আসিয়াছিল। সে মায়ের দর্শন লাভের পর তাহাকে কতিপয় প্রশ্নের অবতারণা ক্রমে যে উত্তর ও প্রতি উত্তর পাইয়াছিল তাহা দ্বারা তাহার মনে বিশেষ তৃপ্তি বিধানের কিছু হইয়াছিল। এমন না হইলেও অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের প্রতি তাহার মন অবনত হইয়াছিল। তাহার প্রস্থানের পর মা রমেশকে বলিল—"এই যুবকটী বেশ, উহার প্রাণে সত্য উপলব্ধির প্রেরণা আছে—উহাকে আমার বড়ই আদর করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" সুরেশ এস্থান হইতে নিজালয় গেল—তাহার স্ত্রী ও পুত্র বর্ত্তমান সে স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ভাবে এই বিষয়ের কোন কথা বাড়ীতে উল্লেখ করিল না—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মাকে দর্শন করিবার পর সে মর্ম্মে মর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞ মাকে লাভ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হইল এবং তদবধি সে প্রায় প্রত্যহই ব্রহ্মজ্ঞ মাকে দর্শন করিত এবং তাঁহার উপদেশের বলে নিজ হৃদয়-কন্দর নিহিত আবিলতা ও মলিনতা দূর করিবার পথ খুঁজিয়া লইল। কিছুদিন এইভাবে গত হইলে পর সে মায়ের পদপ্রান্তে আত্ম-নিয়োগের অনুমতি প্রার্থনা করিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে কি ভাবে আত্ম-তত্ত্ব লাভে সমর্থ হইবে সে পথ খুঁজিতে লাগিল। সুরেশ মায়ের প্রিয়পাত্র ও প্রিয় ভক্ত হইল। মানসিক দ্বৈধ ভাবের ভিতর একটী স্থির অবলম্বন পাইয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা আর কতক দিন এই জগতে বিচরণ করিবার পথ পাইলেন। লেখক তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিল না—সেখানের ঘটনা রাশি তাহার পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ হইয়াছিল মাত্র।

মায়ের ভক্তেরা তাঁহার উপদেশ পাইয়া স্ব স্ব জীবন সার্থক করিবার জন্য যেরূপ উৎসুক ছিল সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-কথা প্রসঙ্গে সমবেত হইয়া মায়ের চিত্ত-বিনোদনে, তদ্রূপ প্রচেষ্টা দেখাইতে লাগিল। অবসর বিনোদনে, সঙ্গীত-সাধনে ভক্তেরা মাকে লইয়া মহানন্দে দিন কর্ত্তন করিতে ছিল। কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মায়ের সেবা-সাধনে, পরিতোষ বিধানে সে স্থানে অভিনব আনন্দ-উৎসের-সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্বাপর ঘটনাচক্রে কেবল জ্ঞানদা সেখানে যাইবার অনুমতি পায় নাই। প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে মায়ের মনের উদ্বেগ অবস্থা অপসারিত হইল, তত্ত্ব কথার আলোচনায় ও ভক্তদের সহিত নিয়ত মানসিক ভাবের বিনিময়ে তিনি পরমানন্দে কিছু কাল কাটাইলেন। এইরূপে ভক্তসঙ্গে মাসত্রয় অতীত হইলে মায়ের শরীর পুনরায় কাতর হইয়া পড়িল। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ"—এই প্রবাদ সত্য আকারে দৃষ্ট হইল। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনও অবসন্ন হইল। তখন ভক্তগণ তাঁহার স্বাস্থ্য-লাভের অনুকূল ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইল এবং গুরু-মাকে দেওঘর লইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ করিল। দেওঘর স্থানটী তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্য-প্রদ স্থান বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা সেখানে যাইয়া বসতি করিবার পক্ষপাতী হইলেন। মাকে দেওঘর লইয়া যাওয়া হইল এবং সহরের উত্তর অঞ্চলে (ওয়েলিংটন টাউনে) এক বাসা

ভাড়া করিয়া তথায় বসতি করার বন্দোবস্ত হইল। তখন মাকে সেবা ও পরিচর্য্যা করার জন্য সুরেশ ঘোষ, নির্গুণানন্দ, ব্রহ্মচারী, সুরেশ, যতীন্দ্র, শাশ্বতানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা তথায় অবস্থিত করিল; আর্থিক বন্দোবস্তের ভার ধীরেন্দ্র সেন গ্রহণ করিল—এবং তদবধি মায়ের জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত ধীরেন্দ্রই আর্থিক ব্যবস্থার মুখ্য সহায়তা করিয়াছিল।

এই সময় দেওঘরে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের ভগ্ন স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে আরোগ্য লাভ করিল—তিনি ভক্তগণের সহযোগে দেওঘরের নির্জ্জন প্রদেশে মনের প্রশান্তি ভাবে আরও কয়েক মাস শান্তিতে অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে প্রিয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তত্ত্ব-কথার আলোচনায় ও ধর্ম্ম সাধনার বিভিন্ন পন্থা বিশ্লেষণ ক্রমে তিনি এক মহানন্দের ফোয়ারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি চিরদিনই নির্জ্জনতা পছন্দ করিতেন—ধর্ম্ম-সাধনে ও ধর্ম্ম-প্রচারে সর্ব্ব বিষয়েই তিনি বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। ধর্ম্ম-ভাবকে নিগূঢ় হইতে নিগূঢ় ভাবে রাখিয়া তিনি চলিতেন—ধর্ম্মের আড়ম্বর তাহার চক্ষের শূল ছিল। তিনি বলিতেন—"যত রাখিবে গুপ্ত তত হইবে শক্ত।" সাধন পথে অনেক সাধক ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্যক পরিজ্ঞাত না হইয়াই শিষ্য ও প্রশিষ্যক্রমে ধর্ম্মকে বাহ্যিক আড়ম্বরে পূর্ণ করিয়া চলিতে অভিলাষী হয় এবং এইজন্য আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মের আবাস-ভূমি তীর্থ-ভূমি ভারতবর্ষে যুগ যুগান্তর ধরিয়া

বহু সাধক সিদ্ধ ও মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বহু অবিচারী নাম-যশঃ-প্রিয় সাধু ও সিদ্ধ ব্যক্তির কার্য্য-কলাপাদির ও প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ মা এই সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু কথা ও বহু উপদেশ দিয়াছেন। মায়ের কথার ভিতর ছিল ভাব-প্রবণতা বিচার ও বৈরাগ্য; তিনি বাহ্যতঃ ছিলেন নিরভিমানী ও কার্য্যে ছিলেন ত্যক্ত পরিগ্রহ এবং বেশভূষায় ছিলেন সরল ও কোনরূপচিহ্ন—পরিহীন! যুগাবতার পরমহংস দেবের ভাবরাশি আমাদের বাল্যজীবনে পুস্তকাকারে কিছু পরিজ্ঞাত থাকায় আমরা ব্রহ্মজ্ঞ মাকে জানিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম। বিচারহীন ও জ্ঞানহীন বহু সাধুর কথার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মা ভক্তদিগকে বিচারবান হইতে উপদেশ দিতেন এবং বিচার ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন যে বিচারহীন পথে চলিলে এবং অযথা কোন সাধুকে অতিরঞ্জিত করিলে নিজ সাধনার সহায়তা লাভ না করিয়া মানুষ দুর্ব্বল ও ভীরু হইয়া পড়ে। জানতে হবে যে তত্ত্ব অতি দুর্গম;—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথ স্তৎ কবয়ো বদন্তি।"
—কঠোপনিষৎ।

আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার মত কঠিন ব্যাপার আর কি হইতে পারে। "যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি।"

যাহা জানিলে সকল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং জন্ম-মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাপুরুষদের উপদেশে মানুষ ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা তাহা উপলব্ধি করে। জন্ম-জন্মান্তর সাধনার ফলে মানুষ মানবদেহেই আত্মাকে জানিতে পারে। আত্মাকে জানিবার জন্য প্রয়োজন—জ্ঞান ও বিচার এবং তৎসহায়ক শ্রদ্ধা ভক্তি এবং অনুরাগ। "শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবেহি—" কৈবল্যোপনিষৎ। কিন্তু বিবেক ও বৈরাগ্য বিহীন হইয়া কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা সেই পরম তত্ত্বকে জানিবার অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি যাহারা হৃদয়ে পোষণ করে তাহাদের নিকট হইতে আত্মা বহু দূরে অবস্থান করে।

"ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" গীতা

ব্রহ্মজ্ঞ মা অনুক্ষণই বলিতেন যে খাঁটি ধর্ম্মের অল্পও ভাল—তাহাতে আত্মা উত্তরোত্তর উন্নত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যত ভাণ চলে, অন্য কোন বিষয়ে তত ভাণ ও প্রতারণা চলে না। কাজেই ধর্ম্ম বিষয়ে ভাণ ও ধর্ম্মের আড়ম্বর ধর্ম্ম-সাধনার প্রধান কণ্টক। গুরু-মা কোন ভক্তের মধ্যে ধর্ম্মাড়ম্বর বা ধর্ম্মের ভাণ দেখিলে বড়ই কুপিত হইতেন। তিনি বৈরাগ্যকে চির আদরের জিনিষ বলিয়া জানিতেন এবং প্রচার করিতেন এবং বৈরাগ্যযুত সন্ন্যাস আশ্রমকেই আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার সুগম পন্থা নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ধর্ম্মের ভাণ এবং কপটতাকে তিনি এতাদৃশ বিদৃশভাবে নিরীক্ষণ

করিতেন যে কোন কপট সন্ন্যাসীকে সংসারী লোক হইতে তুচ্ছ মনে করিতেন, তিনি অনেক সময় সাধু পথে এবং সাধু মতে বিচরণকারী সংসারী লোককে পছন্দ করিতেন এবং নিজ সন্ন্যাসী ভক্ত দিগকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মাড়ম্বরী সন্ন্যাসীকে তিরস্কার করিতেন। ধর্ম্মের পিপাসা যাহার প্রাণে জাগরিত হয় সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে প্রাণের জিনিষ বলিয়া মনে করে—সে কৃপণ ব্যক্তির লুক্কায়িত ধন-রাশির মত আত্মানুরাগ নিভৃতে ও নিগূঢ়ভাবে সাধন করিয়া থাকে। বাস্তবিক ধর্ম্ম সাধন প্রচারের ও প্রকাশের বস্তু নহে। জাগতিক বস্তুর সহিত ইহার তুলনা মিলে না। গোপনে অর্জ্জিত ধর্ম্ম-ভাব এবং গোপনে পরিবর্দ্ধিত ধর্ম্ম-ভাব গোপনেই অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার প্রচার ও পরিচালনা বাহ্যিক বিষয়ের অপেক্ষা করে না—জাগতিক বিষয় এবং তত্ত্ব ভাব পরস্পর বিরোধী ভাব। যাহারা যশঃ মান আকাঙ্খা করে তাহারা আত্ম-রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না এবং আত্ম-রসে তৃপ্ত ব্যক্তি যশঃ ও মানে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে।

প্রাণো হ্যষ যঃ সর্ব্বভূতৈ র্ব্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতি নাতি বাদী।
আত্ম-ক্রীড়ঃ আত্ম-রতিঃ
ক্রীয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্টঃ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

যিনি প্রাণের প্রাণ স্বরূপ পরম ঈশ্বর তিনি ব্রহ্মাদি সকল ভূতে

আভাত হইতেছেন। যেই বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন তিনি অন্য সমস্ত অতিক্রম করিয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন ; আত্মা-বিষয়েই প্রীতি সম্পন্ন হন—এতাদৃশ বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আত্মাই সম্ভোগের বস্তু হয়। যে সকল সাধক সাধনার বলে বলীয়ান হইয়া অসীম মনের-শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় এবং একাগ্রতার গুণে মনের অদ্ভূত ক্রিয়া সাধনে পারদর্শী হয় সেই সকল সাধক মনের বলে বহু অসাধ্য সাধন করিতে পারে ইহা স্বীকার্য্য হইলে ও বিচার-পরায়ণ ও অনুরাগ-সম্পন্ন সাধক জাগতিক ও মায়িক পদার্থকে যেমন আত্ম-রসের প্রতিকূল ও বন্ধনের হেতু বলিয়া মনে করে তদ্রূপ মনের সিদ্ধি-শক্তিকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করে। যে অপরিণামদর্শী সাধক মনের একাগ্রতাবলে-লব্ধ সিদ্ধি-শক্তির মোহে ভুলিয়া যায়, সে জ্ঞান ও বিচার-হীন লোকের মত লক্ষভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং ধর্ম্মের আড়ম্বরে মাতোয়ারা হইয়া শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে ধর্ম্মপ্রচারে ও যশঃ মানে মত্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞ-মা বলিতেন—"ধর্ম্মের-ফেরী-ওয়ালা অনেক আছে।" যাহারা ফেরীওয়ালা তাহারা পরের দ্রব্যই ফেরী করে—নিজের সম্পদ্ তাহাদের নাই। ধর্ম্মাড়ম্বর-প্রিয় লোকদের অবস্থা ও তদ্রূপ ; ধর্ম্ম-সাধনায় তাহাদের শক্তি ও সাধনা কম। যে সময় ব্রহ্মজ্ঞ-মা সর্পদংশন জনিত একাগ্র শক্তির অদ্ভুত ক্রিয়া নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন

তখন তাহার মন গাঢ়বিচার পরায়ণ না হইলে বিপথগামী হইয়া যাইত—এইরূপ অবস্থায় গাঢ় বিচার শক্তি সম্পন্ন সাধক না হইলে সহজেই সিদ্ধির প্রলোভনে পড়িয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ-মা সিদ্ধি-শক্তির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার জীবনের সংস্কার-লব্ধ অসীম মনের একাগ্রতাতে গোপন রাখিয়া চলিয়াছিলেন। এই প্রকার গুপ্ত স্বভাবের ক্রিয়া তাহার চরিত্রে সংস্কার-সিদ্ধ ছিল। সাধক নিজ সাধনার বলে যে সকল মানসিক শক্তি ও সংযম সাধনায় সিদ্ধ হয় তৎসকল প্রায় ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের চরিত্রের সংস্কার লব্ধ ছিল। তাঁহার মনে ছিল অদ্ভুত সংযমের সংস্কার, চিত্তে ছিল অদ্ভুত আত্মানুরাগ। তাঁহার আশৈশব সংস্কার-জাত বিষয়-বিতৃষ্ণা এবং শান্তি অন্বেষণের গতি অলৌকিক ছিল। লোকোত্তর মহাত্মাদের ন্যায় তাঁহার মনে শৈশব কাল হইতে বিষয়-লিপ্সা ছিল না, কোন কামনার স্পৃহা ছিল না; স্বাধীন মনে শান্তি অন্বেষণ ব্রতই তাহার মনের গতি ছিল। সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত ও সমাধি-ভাবে ভরপূর চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ-মা এই কারণেই দেওঘরে অবস্থান করা পছন্দ করিলেন। তিনি একাধিক্রমে ছয় মাস কাল এই নির্জ্জন তীর্থ-স্থানে প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে অতিবাহিত করিলেন। এই সময় ভক্তগণের পরিচিত কোন কোন ভক্ত মাকে দর্শন করিয়া ও তদীয় উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইল। তৎকালে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে দেওঘরে অবস্থিত অমৃত লাল রায় নামে জনৈক ভক্ত মায়ের বিশিষ্ট

সেবক শ্রেণী ভুক্ত হন; অমৃত লাল রায় যশোহর জেলার এক জন ধনী জমিদার ও এডভোকেট। অমৃত রায় তাহার এক বিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রথম মাকে দর্শন করিল এবং মাকে এই কন্যার একটী গতি করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল তদুত্তরে মা বলিলেন "এই কন্যার গতি আপনি চাহিতেছেন, আপনার গতি কি ঠিক হইয়াছে।" এই ভাবে কথার প্রসঙ্গে মা বলিলেন-"বাসনাই সংসার, যাহারা বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে তাহাদেরই সংসার ত্যাগ হইয়াছে এবং সংসার পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্য তাহাদেরই সফল হইয়াছে যাহারা বাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছে।" এই সকল সরল উপদেশে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া অমৃত রায় মায়ের একজন ভক্ত হইয়াছিল এবং পরিশেষে দেওঘরে মঠ স্থাপনে যথোচিত অর্থ সাহায্য করিয়াছিল।

এই সময় সাধু সন্তদাস বাবাজীর জনৈক শিষ্য শিশির ঘোষ মায়ের নিকট যাতায়াত করিত এবং মায়ের বিচারপূর্ণ তত্ত্ব কথা শ্রবণে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়াছিল। তৎকালে মায়ের বিশেষ যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শিশির বাবুর প্রাণে এতাদৃশ প্রেরণা জাগাইয়াছিল যে সে তাহার গুরুদেব বা অন্য কাহার নিকট এরূপ সরল তত্ত্বোপদেশ কখনও শ্রবণ করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং অন্যান্য ভক্তগণ সহযোগে তিনমাস কাল মায়ের সেবা কার্য্য করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছিল। কিছুকাল পরে স্বামী নিগুর্ণানন্দ

ও পরমানন্দ অন্যস্থানে চলিয়া যায়—এবং স্থরেশ ঘোষ (প্রবুদ্ধানন্দজী) মায়ের নিত্য সেবাকারীরূপে মায়ের সঙ্গে রহিল। এই ভাবে ছয়মাস অতীত হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞ মা পুনরায় কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ধীরেন্দ্রনাথ সেনের বাসা বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে ধীরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী মায়ের পরিতোষ বিধানার্থ নিজ হাতে রান্না করিয়া মাকে ভোজন করাইত এবং অন্যান্য সেবাকার্য্য পরিচালনায় মায়ের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল। মায়ের রুগ্ন শরীরে খাওয়ার প্রতি আগ্রহ ছিল না, নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য ছিল না। তখন ধীরেন্দ্র সেনের স্ত্রী যথাচিত পরিচর্য্যা করিয়া মায়ের সন্তোষ বিধান পরিয়াছিল।

কিছুকাল পরে ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজ দেশে বিতারা গ্রামে যাইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি সকল সময়ই আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না এবং দেশে কেবল মাত্র প্রবুদ্ধানন্দ স্বামীজিকে লইয়া চলিলেন। স্থরেশ ঘোষ মায়ের ইতিপূর্ব্বে দেওঘর অবস্থান কালে, সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মায়ের পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়া সর্ব্বদা মায়ের সঙ্গে থাকিত। তখন মায়ের সঙ্গে স্থরেশ ঘোষ সন্ন্যাস বেশে বিতারা গ্রামে পৌঁছিয়া মায়ের নিত্য সেবাকারী রূপে অবস্থান করিয়া তথাকার গ্রামঞ্চলে বস-বাসের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিল এবং নিজ সরল স্বভাবের গুণে সকল স্থবিধা ও অস্থবিধাকে বরণ করিয়া লইল এবং তথাকার গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সকলের প্রতি প্রিয় ব্যবহারের

আদান প্রদানে আনন্দে কয়েক মাস সেখানে বসতি করিল। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ নিকটবর্ত্তী গ্রামে সাচার পাথরে যাইয়া তাহার পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করার সুযোগ পাইয়াছিল, তখন মায়ের প্রিয় ভক্ত রসিক এবং অতুল মাকে দর্শন করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিতারা গ্রামে আসিত। তৎকালে মায়ের অন্যান্য ভক্তদের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আসিল এবং সন্ন্যাস-ভাবে অনেক ভক্ত ভাবিত হইল। ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম স্বামী নির্গুণানন্দ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল; তৎপরে ধরণী দাস ও উমেদালী নিষ্ক্রিয়ানন্দ ও ওমানন্দ নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্ন্যাস পথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎপরে সুরেশ চক্রবর্ত্তী পরমানন্দ নামে ও রমণী চক্রবর্ত্তী শাশ্বতানন্দ নামে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হইয়াছিল। যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'ব্রহ্মচারী যতীন্দ্র' নামে সাধনায় মন দিল। রসিক, অতুল ও হরিপ্রসাদ দেশে বসতি ক্রমে মায়ের নির্দ্দেশমত চিরকুমার সাজিয়া সাধন পথে চলিতেছিল। গৃহীভক্ত কৈলাস চক্রবর্ত্তী, স্বর্ণ কমল রায়, বগলা সরকার, ধীরেন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের ভাব অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম পন্থায় বিচরণ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত মায়ের ভাব প্রবাহে অনুপ্রাণিত বহু ভক্ত মায়ের ভাব-ধারার অনুসরণে নিজ নিজ জীবনের সাধনায় চলিতেছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মাও পূর্ব্ব ভাব পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ পথ লইবার জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি কোন স্থানেই শান্তভাবে বেশী দিন বস-বাস করিতে চাহিতেন না। তিনি পুনরায় বিতারা গ্রাম হইতে বিদায়

লইয়া কলিকাতা যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন বাংলা ১৩৩৮ সনের কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মজ্ঞ মা চিরদিনের জন্য বিতারা গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। স্থানীয় অধিবাসী ও ভক্তগণ মাকে সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিল। কি জানি কোন্ অজানা শক্তির ইঙ্গিতে সে দিনের বিদায়-যাত্রা অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ ও করুণ আকারে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। দুদিন পরই প্রবুদ্ধানন্দ মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা নগরীতে ধীরেন্দ্র সেনের বাসা বাড়ীতে পৌছিল। কিন্তু মা জনবহুল কলিকাতা নগরীতে অবস্থিতি করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন ভক্তগণ মাকে পুনরায় নির্জন দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামে লইয়া গেল। সঙ্গীয় ভক্ত প্রবুদ্ধানন্দ ও যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী মায়ের নিকট নিত্য সেবাকারী হইয়া অবস্থান করিল। অন্যান্য ভক্তগণ মায়ের সেবা কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু মায়ের রুগ্নদেহ অম্লপীড়ায় প্রবৃদ্ধিতে গুরুতর আকার ধারণ করিল—তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য অধিকতর কাতর হইল। তখন ভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতা নগরীতে লইয়া গেল। ব্রহ্মজ্ঞ-মা পূর্ব্ববৎ ধীরেন্দ্র সেনের বাসায় অবস্থান করিলেন। পুরাতন ব্যাধি আরোগ্য হওয়ার অনুকুলে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা চলিল বটে, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় হইল না। তখন ভক্তগণ মাকে অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনে লইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ করিল এবং তদনুসারে মাকে মাদ্রাজ

প্রদেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ওয়াল্‌টেয়ার নামক স্থানে লইয়া যাইবার জন্য ব্যবস্থা হইল। ওয়াল্‌টেয়ার স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ততোধিক সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বলিয়া মা তথায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভক্ত যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী, প্রবুদ্ধানন্দ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর যামিনী চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে লইয়া ওয়ালটেয়ার পৌঁছিল। সেখানকার ব্যয় ভার বহন করিবার জন্য তদীয় প্রিয় ভক্ত ধীরেন্দ্র সেন ব্রতী হইল। তথাকার সামুদ্রিক দৃশ্য ও বিপরীত পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীর প্রচীর সদৃশ দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক ও মনোরম —সেখানের জল-বায়ু স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যের অনুকুল। পুরী ধামের জল-বায়ু অপেক্ষা সেখানের জলবায়ুর বিশিষ্টতা রহিয়াছে —শারীরিক শক্তির উৎকর্ষতা সাধন পক্ষে তথাকার জলবায়ুর সর্ব্ববাদী সম্মত প্রভাব রহিয়াছে। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞ-মা তথায় বসতি করিয়া মানসিক অবস্থার অনুকুল প্রাকৃতিক দৃশ্য-নিচয় নিরীক্ষণ করিয়া ও শারীরিক সুস্থতার কতক আশ্রয় পাইয়া স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলেন। তাঁহার উর্দ্ধগামী মন কতক পরিমাণে শান্ত হইল এবং তিনি মানসিক গতির পরিবর্ত্তনে ভক্তগণ-সহ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পর তাহার স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল এবং তিনি তাহার বহুদিনের অনভ্যস্থ হাঁটিবার শক্তি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কোন পীড়া বশতঃ তিনি হাঁটিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন না—যোগ-প্রাপ্ত গ্রন্থীবিহীন শরীর তাহাকে হাঁটিতে অসমর্থ

করিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ মা বাস্তবিকই মনের তীব্র শক্তিবলেই হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তগণ সহ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ভক্তগণের বিস্ময় জন্মাইলেন। মায়ের এতাদৃশ আনন্দানুভূতি দেখিয়া সঙ্গীর ভক্তগণ কতক দিন শান্তি সুখে বিচরণ করিল। তখন মায়ের যথোচিত সেবা ও যত্ন চলিল। কিন্তু কিছুদিন পরে মায়ের চক্ষু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইল। প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার চিত্ত-বিনোদনে সহায়ক হইলেও তাঁহার অম্লরোগের পরিবর্ত্তন ঘটিল না। এবং তদুপরি তাহার চক্ষু যন্ত্রণা তাহার স্বচ্ছন্দতার প্রতিকূল হইল। ক্রমাগত তথায় তিনমাস অবস্থানের পর তিনি স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন—সেখানের প্রকৃতি পুঞ্জের দৃশ্যাবলী তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে নিরস্ত হইল। তখন সঙ্গীয় ভক্তগণ তাহাকে পুরীধামে সমুদ্রতটে পরিভ্রমণাভিলাষী হইয়া এবং সমুদ্রজলে স্বেচ্ছাক্রমে স্নান বিহারের অভিলাষী হইয়া পুরীতে পৌঁছিলেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের অবস্থানের জন্য সমুদ্র-তটে সহরের পূর্ব্বাংশে নীল-কুঠী আশ্রম ভাড়া করা হইল। সঙ্গীয় ভক্ত প্রবুদ্ধানন্দ প্রভৃতি মায়ের সেবাকার্য্য করিতেছিল। মা তৎসময়ে স্বীয় মনোবলের অভিনব লীলায় সকলকে মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। যেই দুর্ব্বল ছিন্ন-গ্রন্থিদেহ গৃহের বাহিরে যাইতে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করিত সেই দুর্ব্বল দেহের বলেই তিনি চারি পাঁচ শত হাত পরিমাণ পথ হাঁটিয়া সমুদ্রে যাইয়া স্নানে প্রবৃত্ত হইতেন এবং ততোধিক অদ্ভুত ভাব বিস্তার

করিয়া সবল সুস্থকায় লোকের মত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সহিত কেলি করিতেন এবং মনের অভিলাষে স্নান করিতেন—নিজ পায়ে ভর দিয়া আবাস-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ভক্তদের অনুনয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বেচ্ছামত অশন, বসন ও ভ্রমণ করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিতেন। তিনি চৈতন্য-দেবের সমুদ্রে অবগাহনের প্রসঙ্গ শুনিয়া ছিলেন এবং সেই সুখ-স্মৃতি মানস-পটে অঙ্কিত রাখিয়াই যেন মনের বলে সমুদ্রে স্নান-ক্রীড়ার জন্য অভিলাষী হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি পুরীধামস্থ শঙ্কর মঠ চৈতন্য-দেবের সাধন-স্থান, স্বর্গদ্বার প্রভৃতিস্থান পরিদর্শনে আত্ম-তৃপ্তি উপভোগ করিয়াছিলেন। তৎকালে মায়ের মন-ভাবের এবংবিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং মা স্বেচ্ছাক্রমে মানসিক জগতের নিম্নস্তরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন বুঝিতে পারিয়া সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দ নানারূপ পরিকল্পনায় আশ্রম ও মঠ স্থাপনের জন্য তাঁহার আদেশ ও মনোভাবের অপেক্ষা করিতে-ছিল। তিনি আশ্রমাদি স্থাপন প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন ভাব প্রকাশ করিতেন না এবং ভক্তেরা আশ্রম প্রভৃতি করার পক্ষপাতী হইলে তাহাতেও কোন উৎসাহ দিতেন না—তিনি ভক্তহৃদয়ে কেবল অধ্যাত্ম-বীজ রোপণ ব্যতীত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপদেশ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ পছন্দ করিতেন না। কিন্তু এই সময় ব্রহ্মজ্ঞ-মা এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার দেহবসানের পর তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ সাধনার

অনুকূল স্থানে বস-বাসের জন্য আশ্রম করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহা করার চেষ্টা এখন হইতে চলিতে পারে। এরূপ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ-মা ভক্তদিগকে আশ্রম ও মঠ স্থাপনের সুখকর ও প্রকৃষ্ট-স্থান হিসাবে পুরী, দেওঘর ও কাশী এই তিনটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। মায়ের মনে আশ্রম স্থাপনের ভাবের প্রকাশ দেখিয়া প্রবুদ্ধানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা সেই ভাবের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে মা কোন বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। তিনি চাহিতেন ভক্তদের প্রাণে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অনুরাগের ভাবের প্রসারতা। আশ্রমাদি স্থাপনের কথা উল্লেখ করিলে তিনি অমত প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন "তোমরা ধর্ম্মানুরাগী ও বৈরাগ্যবান হইতে পারিলে আমি কুড়ে-ঘরে বাস করিয়াও শান্তি পাইব।" তিনি ধর্ম্ম-প্রাণতা না দেখিলে আশ্রমাদির কথায় ত্যক্ত বোধ করিতেন। বস্তুতঃ বৈরাগ্য ও অনুরাগের সহযোগী না হইলে বাহ্যিক প্রচেষ্টা ও আড়ম্বর মনের হীনতা ও বন্ধন উৎপন্ন করে। অন্তরকে উন্নত করিতে না পারিলে জগতের সমক্ষে ধর্ম্মাড়ম্বর প্রদর্শন করিলে কি লাভ হইবে? উহা কেবল লোহার শৃঙ্খল ধারণের পরিবর্ত্তে সোনার-শৃঙ্খল পরিধান করা মাত্র। খাঁটী ধর্ম্মের অল্পও ভাল এই ছিল ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের উক্তি। "ধর্ম্মস্য স্বল্প-মপি ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—গীতা। সেই জন্যই মা এযাবৎ কাল আশ্রমাদির জন্য ভক্তদিগকে উৎসাহ দেন নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমাদির প্রচেষ্টায় ইচ্ছা প্রকাশ করিলে

তেমন কোন উদ্যম ও উৎসাহ দেখাইতেন না। ব্রহ্মজ্ঞ-মা আশ্রমাদি স্থাপনের পক্ষপাতী হইলে প্রবুদ্ধানন্দ অর্থ সংগ্রহের জন্য কটক সহরে যাইয়া কিছু দিন ঐ প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাহাকে মায়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য সত্বরই পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মা পুরীধামে কিছুদিন মনের উল্লাসে ও উদ্যমে অভিনব ভাবে দিনাতিপাত করার পর স্বকীয় মনের অস্বাভাবিক গতি পরিচালনার ফলে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার উদ্যম ভাব রহিত হইল—ভক্তগণ তাহাকে পূর্ব্ববৎ অসুস্থ এবং অন্তর-রাজ্যের সমাধি রসে নিমগ্ন দেখিতে পাইয়া অধীর হইয়া পড়িল। আশ্রম প্রভৃতি স্থাপনের চেষ্টা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িল। উপস্থিত ভক্ত প্রবুদ্ধানন্দ, শাশ্বতানন্দ, ব্রহ্মচারী যতীন্দ্র, অব্যক্তানন্দ মায়ের তদানীন্তন অসুস্থাবস্থায় মাকে নিয়া ব্যাকুল হইল এবং অন্যান্য ভক্তদিগকে মায়ের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মা নিজেও রসিক, অতুল ও হরিপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তদিগকে দেখিবার ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন তাহারাও মায়ের আহ্বানে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পুরীধামে পৌঁছিল। মা এসময় অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া মানসিক ভাবের এতাদৃশ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে ভক্তেরা নিরাশ ভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। চিকিৎসক নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু চিকিৎসায় কোন বিশেষ ফল হইল না। তাহার মনের পরিপুষ্টতাই ছিল তাঁহার প্রধান ঔষধ। ভক্তগণের প্রতি আকর্ষণে

মানসিক গতি ও ভাব জাগতিক ভাবে নামিয়া আসিলেই তিনি কতক সুস্থতা প্রাপ্ত হইতেন—তাঁহার মন সমাধি রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে দেহ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িত। প্রিয় ভক্ত রসিক, অতুল এবং হরিপ্রসাদ মায়ের পদপ্রান্তে সমবেত হওয়ার পর মায়ের মনভাবের পরিবর্ত্তন হইল এবং তাহার দেহ গ্লানি অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইল। মায়ের মন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিল—মা ভক্তদের প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন—তাহার শিথিল মনে উদ্যম কতক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইল এবং তিনি আশ্রমাদির অনুকুলে নূতন কথার অবতারণায় ও নানাবিধ চিত্ত বিনোদনের ভাবে ভক্তপ্রাণে আনন্দ ধারার সৃষ্টি করিলেন। মা ভক্তগণ সহ এই ভাবে শারিরীক সুস্থতার প্রত্যাবর্ত্তনে আবার কতক সময় পুরীতে বস-বাস করিলেন। সঙ্গীয় ভক্তেরা ব্যতীত উপস্থিত অন্যান্য ভক্তেরা স্বীয় কার্য্যে ফিরিয়া গেল।

ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মত অসাধারণ বিচার ও বৈরাগ্য যাহাদের প্রাণে বিদ্যমান সে সকল অসাধারণ শক্তিবান সাধকের পক্ষে সাধনার বাহ্যিক সুযোগ সুবিধার জন্য অনুষ্ঠিত আশ্রম বা মঠের পরিকল্পনা অবান্তর কথা মাত্র এবং তাহারা আশ্রমাদির তথা কথিত প্রণালীর সার্থকতা বোধ করেন না—বরং অসীম অনুরাগের বশে চালিত হইয়া আশ্রমের গণ্ডীতে থাকিতে পারেন না। আশ্রমাদি কেবল সে সকল সাধকের পক্ষেই অনুকূল যাহারা নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া হাঁটিতে শিক্ষা করিতে পারে না—ক্রম

বিকাশমান চিত্ত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া যে সকল সাধক আত্মানুসন্ধানে চিরাচরিত নিয়ম প্রণালী দ্বারা উদ্দাম চিত্তকে বশীভূত করিয়া আত্ম-দর্শনের পথে বিচরণ করে, ধর্ম্ম-সাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আশ্রমাদি তাহাদেরই বাসস্থান সাধনার স্থান। বিত্থালয় যেমন শিক্ষার্থীর অনুকূল স্থান, তেমন আশ্রম সাধকের সাধনার পরিপোষক ; কিন্তু অসাধারণ শক্তি-সম্ভূত মানবের পক্ষে বিশ্ব-বিত্থালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, সেক্সপিয়র—কালাদাস, রবীন্দ্রঠাকুর প্রভৃতি অসাধারণ মানবের শিক্ষা প্রণালীর ইতিহাস এই কথা সুব্যক্ত করিতেছে। অসীম তত্ত্ব-ভাবে যাহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, যাহারা আশৈশব জ্ঞানের আলোক ধারায় জগতকে দর্পণে প্রতিফলিত ছবির মত মনে করিয়াছেন, যাহারা আত্ম-রসই একমাত্র সম্ভোগের বস্তু বলিয়া বুঝিয়াছেন, যাহারা আশৈশব উদাস মনে তত্ত্ব-কথার পরিকল্পনায় চালিত হইয়াছেন তাহারা কোন আশ্রমে বাস করেন নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ মা নিজমন-বৃত্তির ধারায় পরিচালিত হইয়া ভক্তদিগকে কেবল বিবেকী ও বৈরাগ্যবান্ হইতে উপদেশ দিতেন বাহ্যিক ব্যবস্থাকে তুচ্ছ মনে করিতেন। পরিশেষে সাধারণ সাধকদের দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় পাইয়া, ভক্তদের পক্ষে সাধু-সঙ্ঘের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাবে সম্প্রতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি দেওঘরে একটী অশ্রম স্থাপনের কথা ইঙ্গিত করিলেন এবং ক্রমশঃ পুরী ও কাশীধামে আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুকূল স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ দিলেন। এই প্রস্তাব

অনুসারে প্রবুদ্ধানন্দ স্বামী কটক সহরে চাঁদা আদায় করার চেষ্টা করিল এবং ধীরেন্দ্র সেন কলিকাতার ভিতর এই উদ্দেশ্য নিয়া কতক কাজে অগ্রসর হইল।

কিছুদিন পরে ব্রহ্মজ্ঞ মা স্বাস্থ্য ও মনের স্বচ্ছন্দতার জন্য স্থান পরিবর্ত্তনে অভিলাষী হইলেন। সত্বরই তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল; তথায় তিনি ধীরেন্দ্র সেনের বাসা বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। তথায় তাঁহার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হইল না—কিন্তু গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে একাধারে বেশী দিন অবস্থান করা তাহার রুচির বিরুদ্ধ ছিল। তখন ভক্তগণ মাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইতে মন্তব্য ঠিক করিল এবং মায়ের নির্দ্দেশমত মাকে নির্জ্জন অথচ স্বাস্থ্যকর রাঁচি নগরীতে নিয়া গেলেন। বহু বর্ষ পূর্ব্বে মা রাঁচীতে আসিয়াছিলেন—রাঁচীর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও জল-বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও মা তৎসময় বেশী দিন রাঁচীতে ছিলেন না।

ব্রহ্মজ্ঞ মা প্রবুদ্ধানন্দ ও শাশ্বতানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সমভিব্যবহারে রাঁচীতে পৌঁছিলেন। সুন্দর একটী বাড়ী ভাড়া করা হইল। তৎকালে মা নানাস্থানে ভ্রমণের কৌতুহলে শারীরিক কষ্ট যাতনার ভিতর ও স্বেচ্ছামত বিহার করিতেন। প্রিয় ভক্তগণের সহযোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যপ্রদ রাঁচী নগরীতে বসবাস করিয়াও মায়ের মন স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিল না; মনের স্বচ্ছন্দতা না হওয়াতে স্বাস্থ্যোন্নতির ও তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না। ভক্তগণের প্রতি স্নেহপরবশ

হইয়া যে সকল উপদেশ দিতেন তৎসকলই তাহার হৃদয়ের অন্তর্ম্মুখী আকর্ষণের পরিচয় দিত। তিনি ভক্তদের নিকট কত দেশ দেখার অভিমান, কত ধর্ম্ম-কথার ও ধর্ম্মপ্রচারের চতুরতা দেখাইতেন এবং তাহাদের ভক্তদ্বার নিরাশ মনে আনন্দ দিতে ইচ্ছুক হইতেন।

কোন লোক বহুদিন কোন প্রবাসে অবস্থানের পর দেশে নিজ বাস-ভবনে ফিরিয়া যাইবার জন্য অভিলাষী হইলে, সে যেমন সঙ্গীয় প্রবাসী লোকদের ভালবাসার প্রতিদানে তাহাদের প্রতি ভদ্রতা প্রদর্শন করে, কিন্তু তাহার মনের গতি নিজ বাস-ভবনের প্রতি ধাবিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের মন-গতি তদ্রুপ অবস্থায় বিচরণ করিতেছিল। তিনি প্রিয় ভক্তাদিগকে নিজ জীবনের কথা শুনাইয়া রস অনুভব করিতেন, ভক্তদিগকে জগৎ-মরীচিকার উপদেশ দিয়া তৎপ্রসঙ্গে নিজ জীবনের প্রারব্ধ কর্ম্মের শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতেন—কখন কখন বলিতেন যে তাহার জীবনের প্রারব্ধ বাকী আছে—শিষ্যগণ ভরসা পাইত। কিন্তু এসকল ভাবের ভিতর তাঁহার মানসিক গতি ফিরিয়া আসার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। তাহার মন ক্রমশঃ নির্লিপ্ত আকার ধারণ করিতেছিল, মনের সহযোগে শারীরিক স্বাস্থ্যের অভাব দৃষ্ট হইল। তখন তাঁহার অম্ল-রোগের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল। রাচীর পার্ব্বত্য জল-বায়ু অম্ল-রোগের অনুকূল প্রতীয়মান না হওয়াতে তিনি ভক্তগণের পরামর্শ মত সে স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি বৈদ্যনাথ যাইতে ইচ্ছা

প্রকাশ করেন—কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ পত্রাদি খাওয়ার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা নগরীতে লইয়া যাওয়া হইল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল এবং কিছু দিন কলিকাতা অবস্থান করিয়া মা তথাকার সুবিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসাধীন রহিলেন—ঔষধ-পত্র ব্যবহারে তেমন কোন ফল হইল না—মা লোক-বহুল কলিকাতা নগরীতে বসতি করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। মা কলিকাতা নগরী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া প্রবুদ্ধানন্দ, যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ সহ দেওঘর যাত্রা করিলেন। মায়েয় মনের ও স্বাস্থ্যের অনুকূল একটি সুশোভন বাসাবাড়ী ভাড়া করা হইল। মা সেখানে একাধিক্রমে মাসত্রয় অবস্থান করেন—সেখানেই মায়ের অন্তিম দশার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল।

নবমী বল্লী।

শেষ জীবনের কথা

"মায্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥"
—কৈবল্যোপনিষৎ—

"কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিং
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥"
শঙ্কর বিরচিতা আত্মপূজা।

আত্ম-দ্রষ্টা লোকাওর মানবের জীবনের লীলাভিনয় এবং বিশেষতঃ শেষ-জীবনের প্রসঙ্গ গভীরতম রহস্য-জালে সমাবৃত। মূক যেমন ভাষায় তাহার মন-ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না, তেমন লোকাত্তর মানবেরা তাহাদের অনুভূত ভাব-রাশি ও নিজ অবস্থা কাহার নিকট সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মস্থ-ভাবে নিমগ্ন লোকোত্তর মানবের কিছু বলিবার থাকে না, কিছু বুঝিবার বাকী থাকে না, কিছু জানিবার বা পাইবার বাকী থাকে না—অসীম ধারায় তাহার সমস্ত সত্তা বিনশ্বর দেহের স্বপ্ন-লীলা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ-সত্তায় মিলিবার জন্য স্বতঃই ধাবিত হয় এবং লোকোত্তর মানব কেবল চিন্ময় অচ্যুত অবস্থায় নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর সমাধি-রসে ডুবিয়া থাকিতে চায়; তখন তাহার পূর্ব্ব লীলাপ্রসঙ্গ লুপ্ত হইতে চলে;

তখন তিনি বলেন—"ন মৃত্যু র্ণ শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্মং ন বন্ধু র্ণ মিত্রং গুরু-র্নৈব শিষ্য শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।" আমরা ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতম ভাবে জড়িত থাকিয়া ও তাহার ব্রাহ্মী অবস্থার রস-ঘন অবস্থার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারি নাই। তিনি যখন যে ভাবে আমাদিগকে ধরা দিয়াছেন তৎকালে সেই ভাবেই আমরা তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়াছি—আমরা যে তাঁহার বিস্মৃতির অতল তলে পড়িয়া যাইতেছিলাম। আমাদের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াও আমরা বিশ্বাস হারাইতে পারি নাই। মা বলিতেন—"স্বপ্ন একবার ভাঙ্গিলে আর পুনরায় দেখা যায় না।" আজীবন তাঁহার ভাব ছিল অদ্ভুত ও অসীম রহস্য জালে আবৃত ঃ তাঁহার চিত্ত ছিল নিস্কামত্বের প্রতিফলক—তাঁর মন ছিল চির উদাসী। বিবেক ও বৈরাগ্য সাধনায় মনের যে অন্তর্ম্মুখী গতি ও রসানুভূতি জন্মে তাহা তাহার বাসনা বিহীন চিত্তের সংস্কারে পরিণত ছিল। তিনি বিচার পরায়ণ হইলেও বুদ্ধের মত শান্তি-প্রয়াস ছিলেন, নির্ব্বাণ লাভে বাহ্যতঃ কোন কিছুর অপেক্ষা করেন নাই। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্মে আছে পূর্ণ সত্য, অনন্ত-জ্ঞান এবং অফুরন্ত আনন্দ-রস। সেজন্য সাধকের মনের গতি অনুসারে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন মতে আত্ম-রস অনুভব করেন। বুদ্ধদেব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন নির্ব্বাণ তত্ত্ব; তাহার সাধনার মূলে

ছিল জগতের দুঃখের কারণ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—সাধনার লক্ষ্য ছিল শান্তি লাভ—তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া হিংসা দ্বেষ ও কামনা পরিবর্জ্জন করিয়া নিত্য সত্তার উপলব্ধির পথ উদ্ভাবন করেন। মায়ের মনে ও বিচার চলিত ঐ ধারায় তিনি আত্মার অনুসন্ধানে বাহ্যিক আড়ম্বর বিহীন হইয়া সতত শান্তির পথ অনুসরণ করিতেন—মনের উদাসীন ভাবে বিচরণ করিতেন। সে ভাবে ভাবান্বিত হইয়া তিনি জ্ঞান ও বিচার বলে অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করেন। তিনি বলিতেন—জীব মাত্রই শিব —জীব বাসনা জালে জড়িত হইয়া আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না—বাসনাই জন্মজন্মান্তরের সুখ-দুঃখের কারণ। সৎ বাসনার ফলে সুখের অবস্থা উদিত হয় এবং অসৎ বাসনার ক্রিয়া দুঃখ-ভোগ। বাসনা বিবর্জ্জিত চিত্তেই সত্য পরম ব্রহ্মের একমাত্র উপলব্ধি হইতে পারে। বিচার বলে হৃদয় হইতে বাসনা জাল দূর করিতে পারিলে আত্ম-রসানুভূতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। তিনি অধিকারী ভেদে উপদেশ দিতেন এবং আমাদিগকে বলিতেন যে পূর্ণ-জ্ঞান-পন্থার অনুসরণ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ ভক্তিমিশ্র জ্ঞান আমাদের পক্ষে অনুসরণীয় বলিয়া মা নির্দ্দেশ করিতেন। মা বলিতেন "মানুষ ভাবে যে জ্ঞান-পথ শুষ্ক এবং রস-বিহীন—ইহা বিচার বিহীন লোকের উক্তি মাত্র।" যাহাদের চিত্ত উদাসী হৃদয় নির্ম্মল এবং মন বিচার পরায়ণ তাহারা জ্ঞান-ধারার যে রস আস্বাদন করে প্রেমিক ভক্তদের আরোপিত ভজনার ফলে ভক্ত

সে আনন্দই উপভোগ করে। ভক্তের সাধনা অন্বয়ী!মুখী ; ভক্ত ভগবানকে আনন্দময় সত্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার ধ্যান ও মনন দ্বারা আত্মার রস অনুভব করে এবং জ্ঞানী সাধক অজ্ঞানতার কারণ বাসনা রাশিকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে অপসারিত করিয়া আত্ম-জ্ঞান লাভে পরিতৃপ্ত হয়। "জ্ঞান বিহীনেন ন মুক্তি র্জন্ম শতেন।" —শঙ্কর পদাবলী। ব্রহ্মজ্ঞ-মাও বলিতেন যে জ্ঞানই-শান্তি—জ্ঞানলাভের জন্য বিচার বৈরাগ্য এবং ভক্তির দরকার। "শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগাৎ অবেহি।"—অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করার জন্য শ্রদ্ধা অনুরাগ ও ভক্তি প্রয়োজন।

ব্রহ্মজ্ঞ-মা আশৈশব নির্লিপ্ত-চিত্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন বাসনা কামনাই চিত্তকে বন্ধনে রাখে—জ্ঞান সমুদিত হইতে দেয় না। বাসনা-কামনা-সমুদ্ভাবিত শত-শত জন্মের সংস্কার ছেদনের জন্যই সাধক এত ক্লেশ ও আয়াস সহ্য করে। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের চিত্তে বাসনার সংস্কার খুব কম ছিল ; সে জন্যই কোন গুরু বা পুস্তক-পাঠ তাহার মুক্তিসাধনে প্রয়োজন করে নাই। তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক কোন বিশিষ্ট সাধনার পথে চলেন নাই। তাহার মন স্বতঃই আত্মাভিমুখী হইয়া বিচরণ করিত এবং সেই আত্ম-ধ্যানে তিনি স্বভাবোচিত আনন্দ-রস উপভোগ করিতেন। এই ভাবের জীবন-চিত্র আমরা বর্ত্তমান যুগে আমাদের পরিচিত অপর দুইজন মুক্ত আত্মার জীবনে উদ্ভাসিত হইতে জানিয়াছি। ঢাকার শ্রীশ্রীআনন্দময়ী-মা এবং মাদ্রাজের রমণ মহর্ষির জীবন

কাহিনী এরূপ আজন্ম সিদ্ধ-সংস্কার দ্বারা পরিচালিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং ইহা অবিশ্বাস করা চলে না যে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মত সিদ্ধ সংস্কার লইয়া মহাপুরুষ জগতে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবনে অদ্বৈত পরম ব্রহ্মের স্ফুরণ ও বিকাশ সহজ প্রণালীতে সাধিত হইয়াছিল—তিনি কোন দেব দেবীর পূজা করেন নাই, কোন মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই—কোন সময়ে ব্রহ্মের সহিত দ্বৈততা বোধে ইষ্টনাম উচ্চারণ করেন নাই—সো হহং ভাব এত স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে পরিদৃষ্ট হইত যে কোন দৈহিক গ্লানিতে ও মর্ত্তজীবের মত ভগবৎ-কৃপা যাচ্ঞা করেন নাই। এরূপ অদ্ভূত ও স্বভাবজাত সংস্কার নিয়া আবির্ভূত জীবনের পরিচয় অতি দুর্লভ। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবন, মহর্ষি রমণ মহাপুরুষের কথা এবং আনন্দময়ী মায়ের জীবনচরিত ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের জীবন কথার সহযোগিতা করে এবং ইহাতেই তাঁহার অপ্রচারিত জীবন কাহিনী বুঝিবার সহায়তা পাওয়া যায়। সাধারণ লোক-সমাজের পক্ষে এতাদৃশ উচ্চতম জীবনের কথা বুঝিবার শক্তি সুদুরূহ।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মানসিক গতি ক্রমশঃ অধিকতর উদাসীনতায় পরিণত হইতেছিল—তিনি তৎকালে (১৩৪১ বাং ভাদ্র) কতিপয় ভক্তকে নিয়া দেওঘরে পূর্ব্বকথিত বাসা-বাড়ীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাহার শারীরিক গ্লানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। মানসিক নিরালম্ব ভাবে তিনি উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিতেন। কোন সময় কোন ভ্রমণ-কাহিনীর কথা শুনিলে তাহার মনে

১৪

একটু তৃপ্তির চিহ্ন দেখা যাইত। ভক্তেরা তাহাকে নিয়া বিন্ধ্যাচলে যাইবে, কাশ্মীরের ভূস্বর্গ শ্রীনগরে বাস করিবে ইত্যাদি পরিকল্পনাছলে মা কখন কখন আনন্দ পাইতেন—আবার কখন কখন উক্তি করিতেন যে সকল স্থানই এক ভাবে গড়া কোথায় গেলে চির শান্তি হয় সে প্রসঙ্গই তাহার চিত্ত-বিনোদন করিত। তাঁহার মন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছিল বুঝিতে পারিয়া তিনি দূরদেশস্থ ভক্তগণকে সংবাদ জানাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দেশস্থ ভক্ত রসিক, অতুল ও হরিপ্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের অসুস্থতার কথা ও মন-ভাবের পরিবর্ত্তন শুনিয়া অচিরে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হইল। মানভূম হইতে শাশ্বতানন্দ, রামপদ মুখার্জি প্রভৃতি ভক্ত মায়ের দর্শনে দেওঘর আসিয়া সমবেত হইল। মায়ের ব্যাধি প্রবল আকারে পরিণত হইল। তিনি দৈহিক গ্লানির নিরসন উদ্দেশ্যে ঘন ঘন সমাধি-ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। ভক্তগণ এতদিন পরে বুঝিতে লাগিল যে ব্রহ্মজ্ঞ-মা আর বেশী দিন এই নশ্বর দেহে অবস্থান করিবেন না। দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। এই শারদীয় পূণ্যমাসে মায়ের প্রিয় ভক্তগণ মায়ের পদপ্রান্তে সমবেত হইয়া মাকে জীবনের শেষ সেবা-যত্নে পরিতুষ্ট করিতে ব্যাপৃত হইল। সে সময়ের দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ হইয়াছিল। মা শারীরিক ব্যাধির প্রাবল্যে ও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বিছানায় শুইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন—তাহার বাক্যালাপ মন্দীভূত হইতেছিল। তিনি জ্ঞাপন করিতেন যে

জীবনের অভিনয় শেষ দশায় উপস্থিত হইতেছে; তিনি আর বেশী দিন জগতে বিচরণ করিবেন না। ভক্তগণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন—"মন কিছুর উপরই আট্‌কায় না, মন কিছু অবলম্বন না করিলে কি প্রকারে জীবিত থাকা যায়।" তখন ভক্তেরা পূর্ব্বতন ভাবের বহু কথা, বহু বিষয় এবং বহু আব্‌দার ব্যক্ত করিলে তিনি বলিতেন—"তোমরা যে যাহাই বল না কেন, আমার মন আর কাহার প্রতি আকৃষ্ট নাই, কোন দৃশ্যে রস পায় না; মন চায় কেবল চির বিশ্রাম,—অনন্ত বিরাম।" ভক্তেরা মাকে নূতন সুন্দর স্থানের বর্ণনা করিয়া সেই সকল সৌন্দর্য্যময় স্থানে বস-বাসের প্রস্তাব করিলেন তিনি সাময়িক কৌতুহল প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাহা তাহার মানসিক গতিরোধের কোন চিহ্ন সূচনা করিল না।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনের এতাদৃশ উদাসীন ভাব ও শারীরিক গ্লানির বৃদ্ধি দেখিয়া ভক্তগণ নিরাশ মনে দূর দেশের ভক্তদিগকে সংবাদ জানাইল। ধীরেন্দ্র সেন প্রায়ই মায়ের দর্শনে আসিত এবং এই সময় মায়ের অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগণ সহ মায়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। মানভূম হইতে অনেক গৃহী-ভক্ত মাকে শেষ বারের মত দর্শন করিয়া গেল। সনাতন ব্রহ্মচারী, বিহারী সর্দ্দার, রামপদ মুখার্জি প্রমুখ ভক্তগণ মায়ের দর্শনাভিলাষী হইয়া দেওঘরে সমবেত হইল। দূরস্থ ভক্ত স্বামী নির্গুণানন্দ, পরমানন্দ তখন আসে নাই—প্রিয় ভক্ত স্বর্ণকমল কোন প্রয়োজনে বোম্বে নগরীতে

যাওয়াতে শেষ সময়ে মাকে দেখিতে পাইল না। উপস্থিত ভক্তেরা নিরাশ ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে মায়ের পরিচর্য্যাদি করিতেছিল, দিন ও রাত্রি সকল সময় পালাক্রমে মায়ের পরিচর্য্যা করিতেছিল—দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল—মায়ের বাঁচিবার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। সকলেই মায়ের অবস্থা অনুভব করিতে লাগিল—কিন্তু মানুষের মন আশা দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়; আশাই মায়া বিস্তার করিয়া অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে চায়। কোন কোন ভক্ত মনে করিল মা বহুবারই তীব্র ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন—অনেক সময় অসুস্থ অবস্থায় তাহার মনের গতি ফিরিয়া আসিয়াছে—মা ইচ্ছা করিলে এই সময়ও সুস্থ হইবেন এবং জীবিত থাকিবেন। কিন্তু মায়ের অবস্থা এরূপ আকার ধারণ করিল যে এইরূপ ভাবিবার কোন হেতু উপস্থিত হইল না। মায়ের মন কোন একটী আশ্রয় ব্যতীত সমাধি ভূমি পরিত্যাগ করিয়া জগতে বিচরণ করিতে পারে না—কঠিন রোগের মধ্যেও মন যদি বস্তু বিশেষে পড়িতে থাকে তবে বিলয়-অবস্থা আসিতে পারে না—কঠিন রোগ মনের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে পারে—যাহাতে না লয়-পথ খুঁজিতে পারে—কিন্তু মনের অবলম্বন শিথিল হইলে বাঁচিয়া থাকার কারণ থাকিতে পারে না—ইহা মা আমাদিগকে বহুসময় বলিয়াছেন। মায়ের মন কোন ভুক্তি (খুক্তি) বা উদ্দেশ্য নিয়া আর পূর্ব্ববৎ লিপ্ত হইতেছিল না; সকলই তাহার মনে ভাসা ভাসা ভাবে বিচরণ করিতেছিল। তাহার দৃষ্টিরেখার

পরিবর্ত্তন ঘটিল্—এক দিকে চাহিলে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত দৃষ্ট হইত—ভক্তগণকে কাতর উক্তিতে আহ্বান করিত। অদ্বৈত ব্রহ্মভাবে মনের গঠন তাঁহার এত স্বাভাবিক ছিল যে কোন ঐশ্বরীয় নাম তাহার মুখে শুনা যাইত না—বরং ভক্তের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাহার মহা-সমাধির ভাব স্বতঃই পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

দশমা বল্লী।

—লীলা সংবরণ—

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥"

—মুণ্ডকোপনিষৎ—

পরমাত্মা অমূর্ত্ত অর্থাৎ রূপবিহীন এবং জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ বিকাশমান। তিনি বাহ্য প্রকৃতিতে প্রকাশমান এবং আবার তিনি অন্তরস্থ চিন্ময় এবং নিত্য, জন্ম-রহিত, তিনি নিত্য, শ্বাশত এবং অব্যয়। পরমাত্মার এই ভাবের সম্যক উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরই সাধ্যায়ত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যাক্তিই পরমাত্মাকে এবংবিধ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার এবংবিধ বিশেষণ বিস্তার করিয়াছেন। অনুভবসিদ্ধ অবস্থার সম্যক্ বর্ণনা দেওয়া চলে না—কেবল আভাস উপলব্ধির-ভাষা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ মাকে আমরা তাঁহার অনুভূত অবস্থার কথা, সমাধিরসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"তোমরা এই অবস্থা লাভ কর, এই অবস্থা লাভ করিলে সকল জানিতে পারিবে; এই অবস্থা লাভ না করিলে অনুভবের অবস্থা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?"

তথাপি যদি বলা হইত যে এই অবস্থা লাভ করার মত ক্ষমতা ত সকলের হয় নাই, ইহার বিষয় জানিলে ইহাকে জানার জন্য উৎসাহ হইবে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তদুত্তরে বলিতেন—"সমাধির সমান সুখ নাই, এবং মৃত্যুর মত যাতনা নাই।" তিনি আরো বলিতেন—"আত্মার অনুভূতি অসীম আকাশ ব্যাপী বিরাট হাসিবৎ—আত্মা যেন হাসি দিয়াই আছে এবং অনন্ত।" তিনি আরো বলিতেন মানুষ মিথ্যা বিষয় জানিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু আত্মার বিরাট আনন্দ পাইবার জন্য কাহারও উৎসাহ হয় না—কারণ মানুষের মন বিষয়-রসে ভরা, বাসনা দ্বারা মন ঢোপা (পরিপূর্ণ) বাসনাই মনকে বিক্ষিপ্ত এবং চঞ্চল করিয়া রাখে—বাসনা দ্বারা মন পরিপূর্ণ বলিয়াই মনে আত্ম-চিন্তা জাগে না; চিন্তা করিতে পারে না বলিয়াই মানুষের মনে বিচার জাগে না। সম্যক্ বিচার দ্বারা সংশয় ছেদন করা যায় এবং সত্যই উপলব্ধি করা যায়। মানুষ কেবল সম্মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিতেছে; কাহার ও পশ্চাৎ দৃষ্টি জন্মে না—পরে কি হইবে ভাবিতে পারে না—এইজন্য আত্ম-চিন্তা মনে উদিত হইতে পারে না। মানুষ মাত্রই ভাবিতে পারে না—ভাবনা করা চাইঃ কোন বিষয় চিন্তা করিলে তাহার সন্ধান মিলে। তোমরা চিন্তা কর—চিন্তার দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎ হয়।"

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি
নান্তরাত্মন্।
কাশ্চিদ্বীর ঃ—প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"
কঠোপনিষৎ—

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের পূর্ব্বের কথা শাস্ত্রোক্ত শ্লোকের অর্থকেই প্রতিপাদন করিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ মানুষের মনকে এরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে মানুষ অন্তদৃষ্টি না করিয়া বাহিরের দিকেই দৃষ্টি করিয়া চলে—কেবল কোন কোন মোক্ষার্থী অন্তদৃষ্টি করিয়া সেই অমৃত আত্মাকে জানিতে চায়। মা তাহাই বলিতেন যে মানুষ সন্মুখের দৃষ্টিতেই চলিতেছে—পশ্চাৎ দৃষ্টি করে না। আত্মদ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের সহজ ও সরল কথায় ব্যক্ত উপদেশ ও তত্ত্ব-কথা শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ উল্লেখিত দেখা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনের গতি ও ভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্ববৎ কাহারও অনুনয় বা স্নেহের আব্‌দারে দৃষ্টি করিতেন না। তিনি সতত নির্ব্বাণ-রসের কথা ব্যক্ত করিতেন। এইরূপে তিনি সমাগত ভক্তগণকে লইয়া কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলে পর অলক্ষিতে তাহার রোগাতিশর্য্যে শয্যাশায়ী ভাব ও অবস্থা উদিত হইল। হঠাৎ তাঁহার আহারে অরুচি বৃদ্ধি পাইল—অম্ল-রোগ প্রবল আকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—রীতিমত ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা সত্বেও তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাবে পরিণত হইল। ভক্তগণ আকুল প্রাণে তাহার

পরিচর্য্যা দ্বারা তাহাকে সুস্থ-করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ভক্তগণের ব্যাকুলতায় তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন দেখা গেল না—নির্ব্বাণ-রসে তাঁহার মন অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার বাহ্যিক মনোভাব অধিকতর স্নেহ-প্রবণ ও কোমলতর পরিদৃষ্ট হইল। তিনি ভক্তগণকে স্নেহ মধুর স্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেন "বাবারা তোমরা কে কোথায় আছ, এস, বাবা বড় কষ্ট—এ যাতনা হইতে নিস্কৃতি শ্রেয়।" তিনি ফেল ফেল চক্ষে ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করিতেন এবং তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য ভক্তগণের এরূপ ব্যাকুলতা দেখিলে তিনি বলিতেন "তোমরা প্রার্থনা কর, প্রার্থনা বলে সকল হইতে পারে।" তিনি নিজ জীবনে অদ্বৈত বিচার সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শান্তি প্রয়াসী হইয়া স্থির চিত্তে সকল ভ্রান্তি নিরসন পূর্ব্বক আত্ম সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন—কোন প্রার্থনা বা আরাধনা তাহার মনের গঠনে স্থান পায় নাই। কিন্তু ভক্তদিগকে প্রার্থনার মর্ম্ম, প্রার্থনার ভাব এবং প্রার্থনার শান্তি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। মনকে বাসনা কামনা হইতে বিরত রাখার জন্য, বিচার করার জন্য যেরূপ উপদেশ দিতেন, প্রার্থনা করার জন্যও তদ্রূপ উপদেশ দিতেন। কিন্তু কাহার নিকট প্রার্থনা করা, কি নামে, কি রূপে প্রার্থনা করা ইত্যাদি কোন গণ্ডি বা সীমানা নির্দ্দেশ করা তাহার স্বভাব ছিল না। আত্মা চিন্ময় চৈতন্যস্বরূপ—তাহাকে সাধক যেইরূপে যেই নামে রুচি বোধ করে, সেই ভাবেই প্রার্থনা করিতে পারে এবং সেই ভাবেই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইতে পারে।

বাস্তবিক এই বৈচিত্র্য পূর্ণ জগতে ধর্ম্ম-সাধনার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ধর্ম্ম-আচরণের বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হইলে ও ধর্ম্ম মূলতঃ এক—এবং এই এক ভাবেই বিভিন্ন আকারে লোকের শক্তি ও রুচি ভেদে, দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন ভাবে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির রহস্য-জাল পরিজ্ঞাত হইলে এবং এই বিভিন্ন ভাবের উদ্ভবের কারণ বুঝিতে পারিলে কোন লোক সম্প্রদায়ে গত গণ্ডির ভাবে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেষ এবং বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না—বরং এই জ্ঞান যাহার চিত্তে বিরাজ করে তিনি অন্যের প্রতি সম্মান ও প্রীতি জ্ঞাপনে পরান্মুখ হইতে পারে না। গৌর বর্ণ বিশিষ্ট কোন লোক কি শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মানবোচিত সন্মান পরিদর্শন না করিয়া বিরত থাকিতে পারে? বিচিত্রভাব সমন্বিত সৃষ্টির স্রষ্টা পরমেশ্বরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় গত মানব বিভিন্ন ভাবে সাধনা করিয়া থাকে—এইজন্য হিন্দুধর্ম্মে নানারূপ প্রণালীতে ঈশ্বর সাধনার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। "যত মত তত পথ" পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের উক্তি। ধর্ম্ম সাধনার জন্য বিভিন্ন মহাপুরুষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন পথ চিরদিনই থাকিবে। আপাত দৃষ্টিতে যে বৈষম্যকে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা সেই বৈষম্যকে ভেদ-জ্ঞানের কারণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে—কিন্তু ইহা যে প্রকৃতির বিচিত্রতার কারণেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, চিন্তা করিলে তাহা পরিস্ফুট আকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। প্রকৃত সাধক স্বীয়

নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিচরণ করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজ পন্থানুমোদিত পথে চলিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা পায়। বিভিন্ন ধর্মকে এই ঐক্য-সাধন আধুনিক জগতে ক্ষুদ্রদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য বিষয়।

শারীরিক ব্যাধির প্রাবল্যে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনোভাব নির্ব্বাণ-মুখী হইয়া চলিতেছিল। তিনি সশিষ্য অতিবাহিত দিনগুলির মধ্যে শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার অমিয় স্নেহ-ধারা বর্ষণ করিয়া এই জগৎ হইতে বিদায় লইবার সর্ব্ব প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি শরীরের গ্লানির তীব্রতার ভিতরও ভক্তদিগকে উপদেশ কথা বলিতেন এবং বলিতেন "আমার কাজ শেষ হইয়াছে—মন কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না,—মন খালি বোধ হইতেছে। তিনি হৃত-সর্ব্বস্ব ভাবে শূন্য মনে ভক্তগণের নিকট বিদায় চাহিতেন। মায়ের মনগতি ধরিবার শক্তি কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না—কেবল তাঁহার কথা দ্বারা মহা-নির্ব্বাণের আভাস সূচিত হইতেছিল। মা বলিতেন—"মহা-সমুদ্রের জলরাশি ওজন করা সম্ভব হইতে পারে, তবু আমাকে বুঝিতে পারা বা জানা সম্ভব হইবে না—আমি অতি দূরে অতি উচ্চে থাকিয়া তোমাদিগের প্রতি চাহিয়া বাঁচিয়া আছি।" ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের দৈহিক যাতনা তীব্রতর আকারে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল—তাহার অম্লরোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতেছিল; তিনি কণ্ঠ-নালীতে জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন—তাঁহার আহারের

বাস্তবিক এই বৈচিত্র্য পূর্ণ জগতে ধর্ম্ম-সাধনার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ধর্ম্ম-আচরণের বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হইলে ও ধর্ম্ম মূলতঃ এক—এবং এই এক ভাবেই বিভিন্ন আকারে লোকের শক্তি ও রুচি ভেদে, দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন ভাবে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির রহস্য-জাল পরিজ্ঞাত হইলে এবং এই বিভিন্ন ভাবের উদ্ভবের কারণ বুঝিতে পারিলে কোন লোক সম্প্রদায়ে গত গণ্ডির ভাবে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেষ এবং বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না—বরং এই জ্ঞান যাহার চিত্তে বিরাজ করে তিনি অন্যের প্রতি সম্মান ও প্রীতি জ্ঞাপনে পরান্মুখ হইতে পারে না। গৌর বর্ণ বিশিষ্ট কোন লোক কি শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মানবোচিত সন্মান পরিদর্শন না করিয়া বিরত থাকিতে পারে? বিচিত্রভাব সমন্বিত সৃষ্টির স্রষ্টা পরমেশ্বরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় গত মানব বিভিন্ন ভাবে সাধনা করিয়া থাকে—এইজন্য হিন্দুধর্ম্মে নানারূপ প্রণালীতে ঈশ্বর সাধনার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। "যত মত তত পথ" পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের উক্তি। ধর্ম্ম সাধনার জন্য বিভিন্ন মহাপুরুষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন পথ চিরদিনই থাকিবে। আপাত দষ্টিতে যে বৈষম্যকে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা সেই বৈষম্যকে ভেদ-জ্ঞানের কারণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে—কিন্তু ইহা যে প্রকৃতির বিচিত্রতার কারণেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, চিন্তা করিলে তাহা পরিস্ফুট আকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। প্রকৃত সাধক স্বীয়

নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিচরণ করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজ পন্থানুমোদিত পথে চলিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা পায়। বিভিন্ন ধর্মকে এই ঐক্য-সাধন আধুনিক জগতে ক্ষুদ্রদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য বিষয়।

শারীরিক ব্যাধির প্রাবল্যে ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মনোভাব নির্ব্বাণ-মুখী হইয়া চলিতেছিল। তিনি সশিষ্য অতিবাহিত দিনগুলির মধ্যে শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার অমিয় স্নেহ-ধারা বর্ষণ করিয়া এই জগৎ হইতে বিদায় লইবার সর্ব্ব প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি শরীরের গ্লানির তীব্রতার ভিতরও ভক্তদিগকে উপদেশ কথা বলিতেন এবং বলিতেন "আমার কাজ শেষ হইয়াছে—মন কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না,—মন খালি বোধ হইতেছে। তিনি হৃত-সর্ব্বস্ব ভাবে শূন্য মনে ভক্তগণের নিকট বিদায় চাহিতেন। মায়ের মনগতি ধরিবার শক্তি কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না—কেবল তাঁহার কথা দ্বারা মহা-নির্ব্বাণের আভাস সূচিত হইতেছিল। মা বলিতেন—"মহা-সমুদ্রের জলরাশি ওজন করা সম্ভব হইতে পারে, তবু আমাকে বুঝিতে পারা বা জানা সম্ভব হইবে না—আমি অতি দূরে অতি উচ্চে থাকিয়া তোমাদিগের প্রতি চাহিয়া বাঁচিয়া আছি।" ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের দৈহিক যাতনা তীব্রতর আকারে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল—তাহার অম্লরোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতেছিল; তিনি কণ্ঠ-নালীতে জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন—তাঁহার আহারের

রুচি একেবারে অপগত হইল। তাহার শরীরে ও মস্তকে জ্বালার উদ্ভব হইল—চিকিৎসকের মত অনুসারে তাহাকে বরফ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইল—মস্তকে বরফের চাপ দিয়া রাখিতে হইত এবং কণ্ঠ-নালীর জ্বালা কমাইয়া রাখার জন্য বরফ-টুক্‌রা খাইতে দেওয়া হইত। ভক্তগণ মায়ের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিল—তাঁহাকে অযথা ঔষধপত্র ও পথ্য প্রদানে বিরত হইল। তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল আচরণ ব্যতীত প্রতিকূল আচরণে স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাওয়ার আশা ভক্তগণ সমূলে পরিত্যাগ করিল এবং পরিচর্য্যা ও সেবা করা ব্যতীত তাহার কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করার ইচ্ছা ত্যাগ করিল। তাঁহার উন্মনা ভাব, উদাস দৃষ্টি, অচলাবস্থায় পতিত দেহখানি তাহার পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিল—তিনি যেন এক নূতন লোক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি দিবানিশি সমাধি-রসে ডুবিয়া থাকিতেন—তাহার বাহ্যিক দৃষ্টি বাহ্যিক ভাব লুপ্ত হইতে লাগিল। তাহার অন্তিম দশার দৃশ্য ভক্তগণের নিকট অতীব মর্ম্মন্তুদ ও হৃদয়-বিদারক ভাবে উপস্থিত হইল। অন্তিম দশায় তিনি ভক্তগণের প্রার্থনায় বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া, রোগ যাতনার ভিতর সমাধি-রসে বিভোর হইয়া মহাপ্রয়াণের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তখন স্থানীয় বিশিষ্ট এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে মিহিজামের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ঔষধ-ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু এই সকল আয়াস ও চেষ্টা ব্যর্থ হইতে

লাগিল। তাহার অসহনীয় রোগ যাতনা দেখিয়া ভক্তগণ ক্লিষ্ট মনে মায়ের মহানির্ব্বাণের পক্ষপাতিত্ব সমর্থনে যেন অগ্রসর হইল। অঘটনঘট-পটিয়সী মায়ার খেলা কি বিচিত্র! মা আর বাঁচিয়া থাকিবেন না এই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া তাহারা মায়ের মহা-নির্ব্বাণ-শান্তি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভক্তগণের প্রাণে নশ্বর জগতের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া তিনি বাংলা ১৩৪১ সনের ১৮ই কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাপ্রয়াণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রত্যুষে তিনি ভক্তগণের সহিত কথঞ্চিৎ বাক্যালাপ করিয়া তাহাদের বিষাদ মনে শান্তি প্রদান করিলেন এবং দ্বিপ্রহরের প্রাক্কালে মহা-সমাধি-রসে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সেই অন্তিম দশার অভিনয়ের দৃশ্য ভক্তগণের প্রাণে শোক-তরঙ্গের প্রচণ্ড অভিঘাত করিল। কোন কোন ভক্ত অধীর হইয়া আবার মায়ের বিচারপূর্ণ উপদেশ-বারি সিঞ্চনে শোকানল প্রশমিত করিল। মহানির্ব্বাণ-রসে বিভোর মায়ের অন্তিম দৃশ্যের একখানি ফটো উঠান হইল; পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত তাঁহার দেহ সৎকারের জন্য নীত হইল এবং যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

মানব-জীবনের অভিনয় প্রহেলিকার চিত্র। The world is all a fleeting show—given to man's illusion. মানুষের জীবন পরিবর্ত্তনশীল নাট্যাভিনয়—মোহ-মুগ্ধ মনের খেলা ব্যতীত কিছুই নহে। সাধারণতঃ দশবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া মানব জীবন রঙ্গ-মঞ্চের অবস্থাই দেখাইয়া দেয়—মানব

জীবন একটী ভাবের অভিনয় মাত্র। জীবন-প্রহেলিকার চিরন্তন প্রগতির মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্তার শক্তি পরিস্ফূটনের বিভিন্ন ভাব-রাশি সময় সময় জগতে মহৎ এবং অভূতপূর্ব্ব প্রক্রিয়ার পরিচয় দিয়া থাকে এবং সেই অত্যদ্ভূত ভাব-তরঙ্গাভিঘাতে জগতে নূতন ভাব-ধারা সৃষ্ট হইয়া জীব-জগতের প্রাণে নূতন আলোক-প্রাভ বিস্তার করিয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের মত নিত্য সিদ্ধ মানবের আবির্ভাবে বিশ্ব-জগতের মাঝে একটী নূতন উৎসধারা প্রবাহিত হইল। তাঁহার অপরিসীম ভাব-প্রবণতায় যেই দান জগতের ভাণ্ডারে নিহিত হইল সেই দান মহাপ্রাণ বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মুক্ত লোকোত্তর মানবের কার্য্যাবলীর পরিপূরক হইয়া বর্ত্তমান থাকিবে। আমরা ব্রহ্মজ্ঞ-মাকে তদীয় সাধন প্রণালীতে বুদ্ধের মত, বিচার প্রণালীতে শঙ্করের মত, ভাব-সিঞ্চনে চৈতন্যের মত, ভক্ত-হৃদয়ে জ্ঞানধারা বিতরণে রামকৃষ্ণ দেবের মত ভাবে ভাবিত হইতেন বলিয়া জানিয়াছি। তাঁহার প্রদর্শিত সত্যের আলোকে, তত্ত্ব বিচার-সাধনার-অনুশীলনে বিশ্ব মানবের প্রাণে মুক্তির-ধারা প্রবাহিত হউক এই ছিল তদীয় মনের নিত্য অভিলাষ। বিশ্ব-জগৎ সেই ধারায় লাভ করুক্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মা (কাদম্বিনী দেবীর)এর জন্ম-কুষ্ঠী ॥

১৮০১।১০।৮।৫৩।৭ শাস্তি ৯

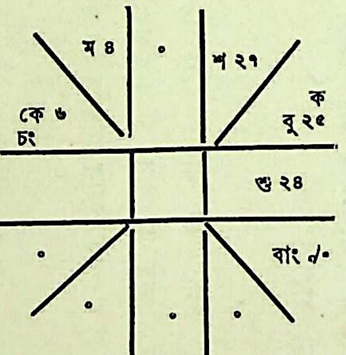
আর্দ্রা নক্ষত্রাশ্রিত মিথুন রাশৌ ১২৮৬ বাং সন ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রৌ— নরগণ. পূর্ব্ব পক্ষীয় একাদশী তিথি পঞ্চবিংশতি দণ্ডাভ্যন্তরে জিবস্থ ক্ষেত্রে রাহু দণ্ডে—

শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী

) ১।২৭৩ (

৬ ৪।৫

জাত চক্র সং



২৮।৭

৬ ৫ ১
১০ ৩৬ ২৪
১ ৪২ ২
২০ ৪ ৯

জাতাহ

পত্রাকী
১০।১৪।৫

৩৯ ১৭ ১৬
৫ ৪
৮ ৩
২ ১৪
২০ ৬ ১০

—পরিশিষ্ট—

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মা কর্ত্তৃক কথিত উপদেশ মালার কতিপয় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল—সম্পূর্ণ উপদেশ কথা পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইল।

(১)

নিজকে জানাই ধর্ম্ম। নিজে কী, ইহা জানিতে পারিলে আর ভুল থাকে না—আর জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু কোন বন্ধন থাকে না।

(২)

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। ঠিক ঠিক জ্ঞান-বিচার চাই। ঠিক ঠিক বিচার করিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা হইলে কিছু ছাড়িবার বা ধরিবার প্রয়াস করিতে হয় না।

(৩)

একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই ক্ষুদ্র মন ভাঙ্গিয়া প্রশস্ত হয়। হিংসা, নিন্দা, যশ মান, কাম ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত হইলেই মন ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া যায়।

(৪)

ত্যাগের বলই বড় বল। বাড়ী ঘর ত্যাগ করার নাম ত্যাগ নহে—হিংসা নিন্দা যশ মান প্রভৃতি কামনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ।

(৫)

সকল কাজের মূল ইচ্ছা। যে পর্য্যন্ত মনে ইচ্ছা না জাগিবে সে পর্য্যন্ত মানুষের মনে কুতর্ক ও কুপ্রশ্ন উঠিবেই উঠিবে। তাহা না হইলে মানুষ নিজে কী এই চিন্তাটী কি করিতে পারে না ?

(৬)

মানুষ কি বিচারহীন! কাহার কথার উপর নির্ভর না করিয়া ও কাহার কথা নিয়া তর্ক বিতর্ক না করিয়া স্বাধীন বিচার দ্বারা কোন মানুষ চিন্তা করিয়া দেখে না—মূল তত্ত্বটী কি ? যদি মানুষের ভিতর বিবেক থাকে, মনুষত্ব থাকে তবে তাহার নিজেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত প্রকৃত তত্ত্ব কোথায়।

(৭)

অনেকেই ত্যাগের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠে। তাহার কারণ এই ত্যাগ কথাটা কি ইহা তাহারা জানে না। তাহারা মনে করে ত্যাগ করা অর্থ পিতা মাতার ভালবাসা ত্যাগ করা, আত্মীয় স্বজন, ঘর বাড়ী ত্যাগ করা। বাস্তবিক ইহা প্রকৃত ত্যাগ নহে এবং এই সকল ত্যাগ করা কঠিন নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা অর্থাৎ নিজের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করাই ত্যাগ ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকাই ভোগ।

(৮)

মানুষ যেই বিষয়ের অধীন হয় সেই বিষয়ই মানুষের মনকে চঞ্চল করে—ইন্দ্রিয় জয় করা যে ত্যাগ ইহাই ত্যাগের চরম নহে। সমস্ত কল্পনা রহিত হওয়াই চরম ত্যাগ।

(৯)

অনেকে মনে করে মানুষ বাসনা ত্যাগ করিয়া কি নিয়া থাকিবে ? যশ মান ধন প্রভৃতি ত্যাগ নিয়া ব্যস্ত থাকা—ইহাই কি বাসনা ? স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা কি বাসনা নয় ? নিশ্চয়ই বাসনা—বাসনার তারতম্য আছে। এক বাসনায় মানুষ বদ্ধ হইয়া থাকে—অন্য বাসনায় মানুষ মুক্তির পথে চলিয়া যায়।

(১০)

মানুষের দোষ সংশোধনের এক মাত্র উপায় সত্যের পিপাসা। সত্যের পিপাসা বাড়ানের উপায় সৎসঙ্গ—সৎ চিন্তা, সৎকথা ও সৎকর্ম্ম।

(১১)

চাই শুধু প্রাণের টান। যত যোগ বল, নিয়ম বল, কেবল ঐ টান- টুক্ লাভের জন্য। ঐ প্রাণের টান না হইলে সকলই বৃথা।

(১২)

বৈরাগ্য আত্ম-দর্শনের মূল উপায়। বৈরাগ্য-বিহীন মস্তিস্ক কখনই অনুভব করিতে পারে না।

(১৩)

মৃত্যু-চিন্তা দ্বারা সহজে মনে বৈরাগ্য জন্মে। মৃত্যুর জন্য যে লোকের মনে ভয় হয় তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার দ্বারাই হইয়া থাকে।

(১৪)

আশাই মনকে স্থির হইতে দেয় না। আশাই মনকে ঘুড়ায়। আশাই বাসনা; আশা ছাড়িতে না পারিলে সুখ পাওয়া যাইবে না। আশাতে শান্তি মিলে না।

(১৫)

শিশুকালে পুতুলের প্রতি শিশুদের খুব আগ্রহ থাকে। বড় হইলে মন আর সে সকল বিষয়ে যায় না। তদ্রূপ জ্ঞান-চক্ষু ফুটিলে সংসারের বিষয় সকল পুতুলের মত নিরর্থক বোধ হয়; তাহাতে মন শান্তি পায় না।

(১৬)

যতদূর ছাড়া যায় (ত্যাগ করা যায়) ততদূরই পাওয়া যায়। জগতের বিষয় মন হইতে যত বিরস বোধ হইবে, ততদূরই সত্য উপলব্ধি হইবে। সকল ছাড়িতে পারিলে সকল পাওয়া যায়।

(১৭)

জীব আসে শূন্য যায় শূণ্য ঃ
সঙ্গে নেয় কেবল পাপ পুন্য।

(১৮)

সর্ব্বদা কেবল অনিত্যতা বিচার করিবে—তবেই সব মায়া মোহ দূর হইবে। জগতের বিষয় সকল অনিত্য বোধ হইলে তাহাতে রস-বোধ থাকিবে না—মন তাহা হইতে সরিয়া পড়িবে।

(১৯)

মানুষ বিষয়-বাসনায় এত চঞ্চল থাকে যে মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে পারে না—কেবল সম্মুখের দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছে। পরে কি হইবে ভাবিতে সময় পায় না। তাহারা স্থির চিত্তে ভাবিতে পারিলে বুঝিতে সক্ষম হইত।

(২০)

কুণ্ডলিনী শক্তি কী ?—কুণ্ডলিনী শক্তি আর কিছু নহে—আত্মাকে পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা-শক্তিই—কুণ্ডলিনী। সেই ইচ্ছাকে প্রবল করবার নামই কুণ্ডলিনীর জাগরণ। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে আপ্‌নিই (স্বভাবতঃ) শ্বাস-ক্রিয়া ও নাড়ীর ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়। নতুবা জোর করিয়া শ্বাস-ক্রিয়া বোধ করিলে কোন লাভ হয় না।

(২১)

যত রাখিবে গুপ্ত—তত হইবে শক্ত ঃ—অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব যত গোপন রাখা যায় ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়—প্রকাশ করিলে তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায়।

(২২)

মানুষ যে জিনিষ ভালবাসে তাহা বাজারে প্রকাশ করে না—তদ্রূপ আত্ম-তত্ত্ব কেহ নিজের সম্পদ বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করে না।

(২৩)

ভোগ দ্বারা কখনও তৃপ্তি সাধন হয় না। ধনী, রাজা, বিদ্বান কেহই বলিতে পারে না যে ভোগ দ্বারা তৃপ্তি হইয়াছে স্বপ্নে আহার করিলে যেমন তৃপ্তি হয় না, ভোগ দ্বারা তেমন তৃপ্তি লাভ হয় না।

(২৪)

একটী ইচ্ছা প্রবল হইলে অপর ইচ্ছা ত্যাগ হয়। এক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অপর দিক দেখা যায় না। আত্মাকে পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে অন্য ইচ্ছা দমন হইবে। এই এক ইচ্ছা প্রবল হওয়া চাই।

(২৫)

বাসনাই সংসার। আসক্তি না থাকিলে সংসার বলিয়া

কিছু থাকে না। আসক্তি ত্যাগ হইলেই মন কিছুতে বদ্ধ থাকে না। আসক্তি-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কোন বস্তুর জন্য আসক্তি না থাকাই তাহার ত্যাগ।

(২৬)

ঠিক বুঝিবার শক্তি চাই। ঠিক ঠিক বুঝিবার ক্ষমতা হইলে অসত্য জিনিষের প্রতি মনের রস কমিয়া যায়; মণ আপনিই সত্যের প্রতি অনুরাগী হয়। খাঁটী বিচার আত্ম-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

(২৭)

মানুষ মরিলে তাহার আত্মীয়-স্বজন বলিয়া থাকে যে—"যে মরিয়াছে সে সারিয়াছে।" কি ভ্রান্তি! এক জনের বিয়োগে যদি অন্যান্যের এত কষ্ট হইতে পারে তবে যে মরিয়াছে তাহার সকলের বিয়োগে কত কষ্ট তাহা কি কল্পনা করা যায়।

(২৮)

গুরু-ব্যতীত কি আত্ম-লাভ হয় না?—হইতে পারে—তবে বড় কঠিন। মুক্ত পুরুষের আকর্ষণ পাইয়াই অতি কম লোক মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে—মুক্ত পুরুষের আকর্ষণ না পাইলে আত্মাকে পাইবার ও জানিবার জন্য ইচ্ছা হওয়া কঠিন, তবে আত্মাকে জানিবার জন্য কাহারও প্রবল ইচ্ছা হইলে, অতি ভাগ্য ফলে আত্ম-তত্ত্ব আপনি আপনি লাভ হইতে পারে—ইহা অতি বিরল। সে জন্য গুরুর আবশ্যক।

(২৯)

মৃত্যু চিন্তার মত অন্য কোন চিন্তাই মনে বৈরাগ্য আনিতে পারে না। সর্ব্বদা মৃত্যু-চিন্তা করিলে মনে সহজে জগতের অসারতা উপলব্ধি হয় ও মন শুদ্ধ হয়।

(৩০)

সকলেই মাটীর উপর দিয়া হাটিয়া থাকে; কিন্তু সেজন্য কাহারও মাটীর জন্য পিপাসা জন্মে না। তদ্রূপ জীবন ধারণের জন্য টাকা পয়সার দরকার হইলেও তাহার জন্য পিপাসা রাখা উচিত নহে।

(৩১)

সাধু হইবার জন্য কোন বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন করে না। যেরূপ মানুষ দশ কাজ করিয়া সংসারে মন রাখিয়া চলে তদ্রূপ ঈশ্বরে মন রাখিয়া—চলিতে হয়। সাধু হওয়ার অর্থ ঈশ্বর-অনুরাগে মনকে রাখা, আত্ম-ভাব উপলব্ধি করা—লোক-দেখান কোন কিছুর প্রয়োজন করে না।

(৩২)

মনের স্থিরতা সাধন দ্বারাই আত্ম-উপলব্ধি হয়—কিন্তু মনকে দপ্ করিয়া নিস্তরঙ্গ করা যায় না। চঞ্চল মনে সর্ব্বদাই নানা কথা উঠা পড়া করিবে—তবে দেখিতে হইবে মনে বিষয় কথা না উঠিয়া যেন সতত বিচার ও বৈরাগ্যের কথা জাগে—তবে মন ক্রমশঃ স্থির ভাব লাভ করিবে।

(৩৩)

ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য—জগৎ কল্পনার তৈয়ারী, মিথ্যা—জলের নীচে গাছের ছায়ার মত জগতের অসারত্ব অনুভব করিবে।

(৩৪)

আত্মাকে জানিতে না পারিলে শান্তি কোথায়? আত্ম-দর্শন না হইলে শান্তি নাই—অদ্বৈত তত্ত্ব জানিয়া আত্মাকে লাভ কর। সং অসৎ সকলই মনের ভ্রম। চক্ষু কচ্‌লান দিলে ঝিকিমিকি কত কিছু দেখা যায়—এজগৎও তদ্রূপ কল্পনার খেলা। ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য ও শান্তিময় ইহা পরিজ্ঞাত হওয়াই ধর্ম্ম।

